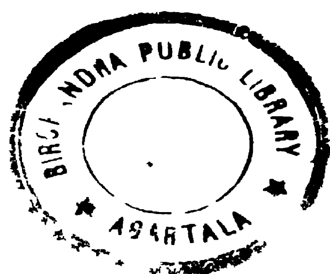
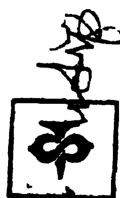
বৈশাখী পূর্ণিমা



করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-১২



প্রথম প্রকাশ আষাঢ়, ১৩৫৫

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা-১২

মুদ্রাকর

প্রফুল্লকুমার বক্সী

১০৯ সি, বিধান সরণি

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী

প্রণব শূর

৬.০০

উৎসর্গ

কাকীমা

শ্রীযুক্তা প্রতিমা মিত্র-কে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

চরণরেখা
বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা
নীল-দুর্গম
পঞ্চপ্রয়াগ
গহন-গিরি-কন্দরে
গিরি-কান্তার
উত্তরস্যাং দিশি
শেষ শিখা

ঢেউ

ঢেউ উঠেছে বদ্ধ জলে, ঢেউ উঠেছে আবদ্ধ মনে। মনের কথা পরে হবে, আগে জলের কথা হোক।

এ জলে জোয়ার-ভাটা খেলে না, তবু বান ডাকে —অমাবস্যায় নয়, পূর্ণিমায়। সে পূর্ণিমা চাঁদের নয়, বিজলীর—ফ্লোরেসেন্ট টিউব আর মার্কারী ভেপার ল্যাম্পের। আজও তেমনি বান ডেকেছে, জলের বুকে ঢেউ জেগেছে।

জলের ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পিয়ানো চলেছে বেজে। সুরের ঢেউয়ে চারিদিক যাচ্ছে ভেসে। সেই তালে তাল দিয়ে কেউ বা ভাসছে জলে—কেউ বা তীরে।

তীরে মানে বেলাভূমি-নয়, সুইমিংপুলের পাশের প্রশস্ত অঙ্গন। মোজেক করা ঝকঝকে আঙ্গিনা, থরে থরে চেয়ার টেবিল, ঝাঁকে ঝাঁকে সভ্য-সভ্যা। যাঁরা জলে নামতে পারেন নি তাঁরাই এখানে ঠাঁই নিয়েছেন। ডাঙায় বসে জলক্রীড়া দেখছেন।

তারপর রাত যখন গভীর হয়েছে, ক্লাবের পাঁচিলের ওপারে বড় রাস্তাটা যখন শান্ত হয়েছে, তখন জলপরীরা তাঁদের সহচরদের নিয়ে ডাঙায় উঠেছেন। হাততালি পিয়ানোর তাল কেটে দিয়েছে। ওরা অঙ্গন পেরিয়ে একে একে গিয়ে ক্লোক-রুমে প্রবেশ করেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুইমিং কস্টিউম পালটে যে যার পোশাক পরে হাজির হয়েছেন আঙ্গিনায়। পছন্দসই মুখ বাছাই করে মুখোমুখি ঠাঁই নিয়েছেন চেয়ারে। বেয়ারা এসে সেলাম ঠুকেছে। বিয়ারের অর্ডার নিয়ে ভেতরে চলে গেছে। একটু বাদে ট্রেতে করে ওয়াইন গ্লাসের উপঢৌকন নিয়ে হাজির

হয়েছে সামনে। ট্রে খালি করে সরে গেছে সেখানে থেকে। একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুনরাদেশের প্রতীক্ষায়। গ্লাসে গ্লাসে সংঘাতের শব্দ হয়েছে। যে শব্দ পিয়ানোর শব্দের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। ওরা যেন একই রাগিণীর তাল ও লয়। দুয়ে মিলে পূর্ণ হয়েছে।

রাতের প্রহর বাড়ে। বাইরের জগৎ শান্ত হয়ে আসে। কিন্তু ক্লাবের জগৎ ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠেছে। পিয়ানো ও গ্লাসের ঐকতান মুদারা থেকে তারায় উঠেছে। কিন্তু ক্লাবের উঁচু পাঁচিল পেরিয়ে এই সুর বাইরের জগতে পৌঁছবে না। অভাব আর অনটন দিয়ে গড়া যে জগৎ। ক্লাবের এই প্রাচুর্যপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে যে জগতের কোন মিল নেই। সেখানে অভাব যত বাড়ছে, এখানকার বৈভব তত বাড়ছে। এই যে সমাজের নিয়ম।

সেই কথাই ভাবছিলেন মিস্টার সোম। কারণ তিনি একদিন সেই জগতের অধিবাসী ছিলেন। পাঁচিলের ওপারে দাঁড়িয়ে এই সুর শোনার স্বপ্ন দেখতেন। সে স্বপ্ন সফল হয়েছে। কিন্তু তবু তিনি সুখী নন কেন? কেন এই আনন্দের ঢেউ তার মনে দোলা দিতে পারছে না?

ক্লাবের সামনে কাঁকর বিছানো প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। একাংশ মালিক-চালিত গাড়ি রাখার জন্য নির্দিষ্ট। বাকি অংশ ড্রাইভার চালিত গাড়ির জন্য—সেখানে কোন প্রহরী নেই। সাদা কালো, লাল নীল, ছোট বড় গাড়িতে সমস্ত প্রাঙ্গণটি প্রায় পরিপূর্ণ। বিভিন্ন মডেলের, বিভিন্ন রাজ্যের নম্বরযুক্ত দেশী-বিদেশী নতুন নতুন গাড়ি। মালিক-চালিত অংশে তবু যা হোক খানিকটা জায়গা এখনও রয়েছে। কিন্তু অপরাংশে তিলার্ধ স্থান নেই, অথচ বেশ কয়েকখানি মালিক-চালিত গাড়ি সেখানে ঠাঁই পেয়েছে। 'ড্রাইভিং' ইজ এ গ্রেট প্লেজার' বলতে ওরা পঞ্চমুখ। কিন্তু সুযোগ

পেলেই নিঃশব্দে এই অংশে গাড়ি রেখে ক্লাবে প্রবেশ করেন এবং আসর ভাঙার মুখেই সবার আগে এসে গাড়ি নিয়ে তেমনি নিঃশব্দে মিলিয়ে যান। মুখে যাই বলুন, ড্রাইভার রাখার অক্ষমতা সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতন।

মিস্টার সোমের তীক্ষ্ণ নজর থেকে কিছুই বাদ পড়ে না। তিনি ওদের দেখেন আর মনে মনে হাসেন। তাঁকে যে সব কটা ধাপ পেরিয়েই আজ এখানে পৌঁছতে হয়েছে।

গাড়ির প্রাঙ্গণ তথা ক্লাবের বহিরাঙ্গন পেরিয়েই একটি সুবৃহৎ দ্বিতল বাড়ি। নিচের তলায় অধিকাংশ জায়গা জুড়ে হলঘর—নরম গালিচায় আবৃত। কয়েকখানি দামী সোফা ও সেণ্টার টেবিল। এক-পাশ দিয়ে চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সঙ্গেই বার-কর্নার। পাশের ঘরদুখানি বিলিয়ার্ড ও টবিল টেনিসের জন্য নির্দিষ্ট। হলঘর পেরিয়েই বারান্দা। তারপরেই ঝকঝকে আঙ্গিনা—যেখানে আজ আসর বসেছে।

আর কেউ কিন্তু মিস্টার সোমের মত নয়। তাঁরা সবাই আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। কয়েক রাউণ্ড ড্রিংকস ইতিমধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাই তাঁদের চোখে রঙীন চাহনি, মুখে উগ্র সুবাস আর মনে প্রজাপতির নেশা। এক ফুল থেকে আর এক ফুলে উড়ে গিয়ে মধু পানের আকণ্ঠ তৃষ্ণা।

মিসেস সোম পোষাকে নবীনা হলেও বয়সে নবীনা নন। কারণ এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে যে কালটা নবীনা ও প্রবীণাদের সীমারেখা বলে ধার্য, সে কাল তাঁর জীবনে বহুকাল গত হয়েছে। সাদা চোখে লক্ষ্য করলে এ সত্য বোঝা যাবে। কারণ কসমেটিক্স-এর গভীর প্রলেপ তাঁর বয়সের বোঝাকে হাল্কা করতে পারে নি। বব্‌ছাঁটা কুন্তলরাশির মধ্যে বেশ কয়েকগাছি শ্বেত-শুভ্র কেশের দর্শন মেলে। এখন আর তিনি বন্ধুদের বাহুপাশে বদ্ধ

হয়ে আগের মত অনির্দিষ্টকাল ধরে নাচতে পারেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁফিয়ে ওঠেন। তবু ক্লাবের আকর্ষণ তাঁর জীবনে আজও অপরিবর্তিত। সেই কথাই একটি কন্যাসমা বান্ধবীকে বোঝাচ্ছিলেন মিসেস সোম। মিসেস সাধনা সোম বি. এ.। আদর করে বন্ধুরা ডাকেন 'স্যাডি'। সে ডাকে সানন্দে সাড়া দেন তিনি। যদিও স্যাডনেস-এর সঙ্গে জীবনে তাঁর কোনদিন মোকাবিলা হয় নি।

ঠোঁট উলটে মিসেস সোম বান্ধবীটিকে বলছিলেন, "আর ভাই বল কেন। সংসারের ঝামেলা মেটাতেই গিয়েই জীবন শেষ। মার্কেটিং থেকে সোসাল অবলিগেশান্, সব কিছুই আমাকে ম্যানেজ করতে হয়। তোমাদের মিস্টার সোমটি তো তাঁর বিজনেস আর স্পেকুলেশন নিয়েই ব্যস্ত।"

"তা আজ আবার কি হল? এত দেরি করে এলেন কেন?" বান্ধবীটি কৌতূহলী হয়ে পড়েন।

"ঝামেলা। ড্রেস আপ করে ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলেছি। হঠাৎ অনিন্দ্যের বাৎসল্য রস উথলে উঠল। বলে বসল --অসুস্থ খোকনকে একা ফেলে রেখে পার্টিতে আসা উচিত হবে না।"

"তাই নাকি? খোকনের বুঝি অসুখ? কি হয়েছে?"

"ওঃ, তোমাকে বলাই হয় নি। যত ঝামেলা। আজ দুপুর থেকে হঠাৎ ছেলেটার জ্বর। শেষে ডক্টর বোসকে কল দিয়ে, ওর পাশে বসিয়ে তবে এখানে এসেছি। তাই তো দেরি হয়ে গেল।"

মিস্টার সোম কিন্তু কিছুতেই আজ মিসেসের মত সহজ হয়ে উঠতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে আসতে হয়েছে এই নৈশ আসরে। শুধু স্ত্রীর অনুরোধেই নয়, ব্যবহারিক প্রয়োজনেও বটে। এ সব আসরে না এলে সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়া যায় না।

সে স্বীকৃতি না থাকলে, আজকের সমাজে বড় হওয়া সম্ভব নয়। তবে তিনি আজ উপস্থিত হয়েও যেন অনুপস্থিত। পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে কিছুতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন না। ক্লাবে ঢুকতেই ওরা তাঁর কুশল জিজ্ঞেস করেছেন। চিরাচরিত প্রথায় মৃদু হেসে তাকেও বলতে হয়েছে "ভাল"। মনের অবস্থাকে গোপন রেখে বিলিয়ার্ড টেবিলের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। রঙীন পানীয় হাতে নিয়ে মিসেস খাসনবিশের সঙ্গে রসিকতা করতে হয়েছে। মিসেস ধরের মেদবহুল দেহধারণ করে বলনাচ নাচতে হয়েছে। সেই সঙ্গে শুনতে হয়েছে নিজের জীবনকাহিনীর কয়েকটি পাতা। মিসেস ধর আজ মিসেস সোম হলে, মিস্টার সোম কত সুখী হতেন—সেই ফর্দ পুনরায় পাঠ করেছেন মিসেস অঞ্জনা ধর। বিবাহপূর্ব জীবনে অঞ্জনা যখন মিস চৌধুরী ছিলেন, তখন অনিন্দ্য সোমের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। টেনিস আর পিকনিকের মাধ্যমে অনেকটা দূর এগিয়েও গিয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন নি। প্রায় তীরে এসে তাঁর তরী ডুবেছে। ডুবিয়েছেন মিস দত্ত—আর তিনিই শেষ পর্যন্ত মিস্টার সোমের জীবন-নায়ের কাণ্ডারী হয়ে বসেছেন। তবে মিস চৌধুরীও ডুবে যান নি। যথা সময় তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন ডক্টর ধর। তিনি তখন সানন্দেই মিসেস ধর হয়েছিলেন, কিন্তু মিসেস সোম না হতে পারার দুঃখ তাঁর আজও ঘোচে নি। সুযোগ পেলেই নাচের আসরে তিনি মিস্টার সোমের বাহুলগ্না হন। কেউ কিছু মনে করেন না। কারণ তাঁরা সকলেই পরকীয়াতত্ত্বে সমান বিশ্বাসী।

নিমন্ত্রিত বাধ্য হয়েই আজ মিস্টার সোমকে পার্টিতে আসতে হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন না। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উত্তাপহীন আচরণ মিসেস

ধরের বিরক্তি উৎপাদন করল। তিনি সোমকে ছেড়ে মিস্টার মেহেরাকে ধরে বার কর্নারের দিকে অগ্রসর হলেন।

ঠিক এমনি একটি ব্রাহ্ম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় ছিলেন মিস্টার সোম। সকলের অলক্ষ্যে তিনি পালিয়ে এলেন সেই উদ্দাম রঙ্গজগৎ থেকে। টেনিস লন ছাড়িয়ে বাগানে প্রবেশ করলেন। এখানে উদ্যানের উদ্দামতা নেই, কিন্তু গভীরতা আছে। উজ্জ্বল আলো যাদের রাসলীলায় বাধার সৃষ্টি করেছিল, তাঁরা জোড়ায় জোড়ায় জড়ো হয়েছেন এই আঁধারে। কিন্তু ওরা নিজেরাই নিজেদের নিয়ে মগ্ন। মিস্টার সোমের দিকে নজর দেবার অবসর কোথায়? মিস্টার সোম ওদের এড়িয়ে একটু দূরে একটা জায়গায় বসে পড়লেন। বসে বসে ভাবতে থাকলেন তাঁর নিজের কথা. বর্তমান ও অতীতের কথা, চাওয়া আর পাওয়ার কথা।

তিনি কি এই চেয়েছিলেন? হ্যাঁ। তিনি তো বড় হতেই চেয়েছিলেন। তিনি বড় হয়েছেন। না হলে, তাঁকে আজ এই আসরে আসতে হত না। তিনি তাঁর অসুস্থ পুত্রের পাশে বসে থাকার অধিকার পেতেন। যে অধিকার ছিল তাঁর দরিদ্র পিতার, ছিল তাঁর স্নেহময়ী জননীর।

অজ পাড়াগাঁর এক অভাবের সংসারে জন্ম নিয়েছিলেন অনিন্দ্য সোম। তাঁর বাবা দূরগঞ্জের এক মহাজনের গদীতে খাতা লিখতেন। খেয়ে পরে থাকাই কষ্টকর ছিল, তাঁর স্কুলের মাইনে তো দূরের কথা। মা হেড মাস্টারমশাইকে ধরে ফ্রিশিপ যোগাড় করেছিলেন। লেখাপড়ায় মোটামুটি মন্দ ছিলেন না অনিন্দ্য। ভালভাবেই ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন। কিন্তু কলেজে ভর্তি হতে পারেন নি। আর ভগবানের কি বিচিত্র লীলা! সেবারেই সব দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁর কাঁধে। বাবা লিউকোমিয়া রোগে আক্রান্ত হলেন। মায়ের সামান্য যা গয়না ছিল, তাই বেচে

বাবাকে নিয়ে কলকতায় এলেন অনিন্দ্য। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করলেন। যমে মানুষে টানাটানি চলল। শেষ পর্যন্ত পরাজিত হল মানুষ। ষোল বছরের ছেলের ওপর সংসারের সব দায়িত্ব চাপিয়ে চোখ বুজলেন বাবা। দেশে ফিরে গিয়েছিলেন অনিন্দ্য। কিন্তু শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যেতেই আবার চলে এসেছিলেন কলকাতায়। জীবন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। সে যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন মিস্টার সোম। অনেক ঘাটে জল খেয়ে অবশেষে পারমিট আর কালোবাজারের খেয়াতে ঠাঁই পেয়েছিলেন তিনি। সেই খেয়ায় চড়ে, অভাবের গঙ্গা পেরিয়ে, প্রাচুর্যের ঘাটে এসে ভিড়েছিলেন আপন অধ্যবসায়। সেই মূলধনকে সম্বল করে ইণ্ডাস্ট্রির দৌলতে তাঁর ঐশ্বর্য চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। তিনি এখন বিশিষ্ট শিল্পপতিদের অন্যতম। আজ তার কোন অভাব নেই। আজ তিনি সমাজের একজন।

তাহলে তিনি আলো-ঝলমল ক্লাব-প্রাঙ্গণ থেকে কেন পালিয়ে এলেন এই আঁধার উদ্যানে? কেন তিনি ওদের মত আনন্দের ঢেউয়ে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারছেন না? তবে কি অগাধ ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হয়েও তাঁর অভাব ঘোচে নি?

আজ বহু বছর বাদে অকস্মাৎ অতীতের মুখোমুখি হয়েছেন মিস্টার সোম। দুঃখভরা কৈশোরকালের সুখস্মৃতি তাঁকে বার বার ব্যাকুল করে তুলছে। তিনি ভেবে চলেছেন সে সব দিনগুলির কথা, যখন তিনি তাঁর ছেলে খোকনের মত ছোট ছিলেন। তাঁর মনে পড়ছে বাবার কথা। শেষ রাতে উঠে চারটি চালভাজা চিবিয়ে বাবা রওনা হয়ে যেতেন কাজে, আর বাড়ি ফিরে আসতে রাত হয়ে যেত। এই হাড় ভাঙা খাটুনি খেটেও তিনি অভাবের হাত থেকে রেহাই পান নি। তবু অনিন্দ্য কত সুখী ছিলেন—কত আদর আর কত যত্নে বাপ-মা তাঁকে মানুষ করেছেন। তাঁদের

কত স্বপ্ন ছিল অনিন্দ্যকে ঘিরে। আর খোকন? শিল্পপতি মিস্টার সোমের একমাত্র সন্তান? সে বেশি সুখী? না সেই মহাজনের মুহুরীর ছেলে কিশোর অনিন্দ্য বেশী সুখী ছিল?

এই প্রশ্নটাই বিষাক্ত ছুরির মত অবিরত তাঁর বুকে বিঁধছে। মনে পড়ছে—একবার—বর্ষায় ভিজে অনিন্দ্যের খুব জ্বর এল। বাবা তখন মহাজনের কাজে কয়েকদিনের জন্য শহরে গেছেন। ডাক্তার ডাকা তো দূরের কথা, পথ্য কেনার মত সংস্থান ছিল না তাঁর মার। অসহায়া জননী পাশের গাঁয়ের দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে ওষুধ নিয়ে এসেছিলেন। গাঁয়ের জমিদার বাড়ি থেকে সাগু-বার্লি চেয়ে এনেছিলেন। যাবার সময় পাশের বাড়ির কাকীমাকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলেন অনিন্দ্যের কাছে। তবু ফিরে এসে তাঁর, কি চিন্তা। যে কদিন অনিন্দ্যের জ্বর ছাড়ে নি, সে কদিন তিনি ঠিক মত রান্না খাওয়া পর্যন্ত করেন নি। সারা রাত তাঁর মাথার কাছে বসে থাকতেন, আর থেকে থেকে ভগবানকে ডাকতেন। কি উৎকণ্ঠা, কি দুশ্চিন্তা, কি অস্থিরতা!

বিত্তহীন জনক-জননীর সন্তান বিত্তবান মিস্টার সোম আজ অস্থিরমনে সেই অমূল্য মাতৃস্নেহের কথা ভাবছেন। আর ভাবছেন তার একমাত্র সন্তান হতভাগ্য খোকনের কথা।—এত ঐশ্বর্যের মধ্যেও যে প্রকৃত ঐশ্বর্যের সন্ধান পেল না।

খোকনের কথা ভেবে তাঁর চোখ দুটি বার বার সজল হয়ে আসছিল। তাই তিনি পালিয়ে এসেছেন এখানে। ওখানে কেউ দেখতে পেলে যে তাঁর সামাজিক অমর্যাদা হত। সমাজ তাঁকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ করেছে। তাঁর কাঁদার অধিকার হরণ করেছে।

প্রায়শ্চিত্ত

খস্ খস্ খস্! আবার শব্দটা হচ্ছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসি। খাটিয়াটা নড়ছে কেন?

না, আর নড়ছে না। টর্চটা হাতে নিই, আলো জ্বালাই।

নিশুতি রাত চমকে ওঠে। গহন আঁধার দানা বাঁধে, ঘরটা আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে। আলোটাকে তাড়াতাড়ি চারিদিকে ঘোরাই। আলো আর আঁধারের লুকোচুরি খেলা চলে। কিন্তু কোথায়? কেউ নেই, কিছু নেই।

শব্দটা সত্যই হয়েছিল কী? আমি তো জেগেই আছি। কিছুক্ষণ আগেও আরেকবার শব্দটা হয়েছিল। আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠেছিলাম, "কে?"

সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা থেমে গিয়েছিল। আমি চোখ মেলে শুয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই শব্দ। তাড়াতাড়ি উঠে বসে আলো জ্বালিয়েছি।

রাত এখন ক'টা? বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বের করি— দুটো বাজতে দশ। বৃষ্টিটা থেমে গেছে কী? চালের ওপরে কোন শব্দ হচ্ছে না তো। অথবা সশব্দ বারিপাতের বদলে নিঃশব্দে তুষারপাত হচ্ছে। প্রকৃতি নীরবে তার রূপ পরিবর্তনের পালা সাঙ্গ করছে। কাল সকালে উঠে দেখবো, চারিদিক সাদা হয়ে গেছে। সকাল? সে তো বহুদূর। আগে এই কালরাত্রির অবসান হোক।

শব্দটা কিসের? এই শৈলপুরী ঢাকুরীর ডাকবাংলো কি তাহলে ভূতুড়ে বাড়ি। কিন্তু কেউ তো সেকথা বলে নি। পিণ্ডারী

হিমবাহ আসা-যাওয়ার পথে অনেকেই এই ৮৬০০ ফুট উঁচু ডাকবাংলোতে রাত কাটিয়ে যান। এখানে প্রচণ্ড শীত, চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে কোন লোকালয় নেই। তবু তাঁরা থাকেন। কারণ এমন নির্জন সুন্দর পাহাড়ী আবাস খুব বেশি নেই হিমালয়ে। সামনেই তুষারাবৃত শৈলশিখর, পেছনে ঘন সবুজ বনমালা। আমিও এই অপরূপ পরিবেশে, ডাকবাংলোর প্রশস্ত কক্ষে একাকী রাত্রিবাসের লোভ সংবরণ করতে পারি নি। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

খস্ খস্ খস্! আবার সেই শব্দ।

"কে? কৌন্ হ্যায়?" প্রাণপণে চিৎকার করে উঠি। শব্দটা তেমনি থেমে যায়। টর্চ জ্বেলে তাড়াতাড়ি খাটিয়া থেকে নেমে পড়ি। এই শীতে কম্বল ছেড়ে মেঝেতে নামা, রীতিমত শাস্তি। ডাকবাংলোর মেঝে কাঠের তৈরি। তার ওপরে কার্পেট পাতা। তবু ভীষণ ঠাণ্ডা। কিন্তু ঠাণ্ডার কথা পরে হবে। আপাতত ভয়ের চোটে শীত পালিয়েছে।

অথচ আগন্তুকরা এতটা পথ ভেঙে এখানে এসে এ সময়ে আমাকে আক্রমণ করল কেন? কি আছে আমার কাছে? আমি পর্যটক—সামান্য কিছু টাকা আর নেহাত অপরিহার্য কিছু পোশাক-পরিচ্ছদই তো আমার ঐশ্বর্য। সেটুকু কেড়ে নেওয়াই যদি তাদের আক্রমণের কারণ হয়ে থাকে, তাহলেও এত রাতে এখানে আসার কি দরকার ছিল? যেখানে চতুর্দিকে চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে কোন জনবসতি নেই, সেখানে গতকাল বিকেলে বা আগামীকাল সকালেও আমার সর্বস্ব লুট করতে পারত।

যে কারণেই হোক, তারা এই নিশুতি রাতকেই রাহাজানির প্রকৃষ্ট লগ্ন বিবেচনা করে আমাকে আক্রমণ করেছে। কাজেই ওদের সঙ্গে আমাকে বোঝাপড়া করতেই হবে। কিন্তু আমার

লাঠি ? লাঠিটা যে বারান্দায় রেখেছি। তারা যদি বারান্দায় থেকে থাকে ? তাহলেও আমাকে যেতে হবে। যে ভাবেই হোক লাঠিটা চাই। আর মোকাবেলা যখন অনিবার্য, তখন হয়েই যাক। কাপুরুষের মত বদ্ধ ঘরে দম আটকে মরে কি লাভ ?

লাঠির বদলে জ্বলন্ত টর্চটা ডান হাতে বাগিয়ে, বাঁ হাতে দরজার ছিটকিনিতে টান মারি। সশব্দে দরজা খুলে ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে আসি। কিন্তু এ কি ! এখানে যে কেউ নেই, কিছু নেই।

শুধু ত্রয়োদশীর চাঁদ জেগে আছে নীলাকাশের বুকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে কে বলবে, সন্ধ্যাসমাগমে অমন ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে। দুর্যোগের সেই কালিমার কোন চিহ্ন নেই এখন। তবে আকাশ মেঘমুক্ত নয়। আর তাই বোধহয় তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু-এক ফালি সাদা সাদা মেঘ। শ্বেতশুভ্র বলাকাকুলের মত আসা-যাওয়া করছে। চাঁদের আলোয় তাদের রূপান্তর ঘটছে—তার রং পালটাচ্ছে। চাঁদের আলো পড়েছে সামনের ঐ তুষারাবৃত শৃঙ্গমালার শিরে। যেন রুপোর মুকুট পরে ওরা আমার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে আর হাতছানি দিয়ে ডাকছে কাছে—আরও কাছে। তাদের অসীম বাহুর বন্ধনে, আকুল প্রাণের মাঝে।

কিন্তু এখন সে ডাকে সাড়া দেবার সময় নেই। বেঁচে থাকলে পরে অনেক সময় পাওয়া যাবে। কাজেই আগে বাঁচার চেষ্টা করা যাক। লাঠিটা হাতে নিয়েছি। আমার দুর্গম পথের পরম প্রিয় এই যষ্টি, আজ আমার একমাত্র সম্বল। তাহলে কি এবারে বাইরের দরজা খুলব ? ছুটে যাব চৌকিদারের কাছে ?

এই মনুষ্যবর্জিত ঢাকুরীর একমাত্র স্থায়ী বাসিন্দা। কাঁচা পাকা একমাথা অবিন্যস্ত চুল, মুখভর্তি দাড়িগোঁফ, রক্তবর্ণ দুটি কোটরাগত চোখ। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন তবু বেশ শক্ত-সমর্থ।

দেখে মনে হয় রক্ত এখনও বেশ গরম আছে। তাই বোধহয় গরম পোশাকের প্রয়োজন হয় না। একটা খাকি পাজামা ও ছেঁড়া কোর্তাতেই তাকে কাল সারা বিকেল কাটাতে দেখেছি। সে সারাদিন আগুন পোহায়, ভজন গায়, আর গাঁজা খায়। দিনান্তে দুখানি মাত্র রুটি চিবিয়ে মহানন্দে নিদ্রা দেয়। এখন বুঝতে পারছি, তার এই উপবাস ও ভজন ভেক ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে লোকটা ভয়ঙ্কর। যারা এই গহন রাতে আমাকে আক্রমণ করেছে, তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই ওর জোট বাঁধা আছে। ওর সাহায্য না পেলে কারও পক্ষে এখানে এসে পরদেশী পর্যটককে আক্রমণ করা সম্ভব নয়। রক্ষকই ভক্ষক হয়েছে।

সে না হয় হল। এখন উপায় কী? কেমন করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবো? উদ্ধারের কথা পরে ভাবা যাবে। আগে সেই বেইমানটাকে সাজা দিতে হবে—উপযুক্ত সাজা। ধার্মিকের ভেক ধরে সে যাতে আর কোনদিন কোন যাত্রীর এমন সর্বনাশ না করতে পারে। তাতে যদি আমার মৃত্যু হয় তাও ভাল।

বাইরের দরজাটা খুলে ছুটে চলি চৌকিদারের ঘরের দিকে। ডাকবাংলো থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে, একটু নিচে।

হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। শয়তানটা দোর বন্ধ করে ভেতরে আছে। প্রতীক্ষায় আছে কখন তার সঙ্গীরা কাজ হাসিল করে ফিরে আসবে। কিন্তু এতটা পথ যে ছুটে এলাম, তাদের সঙ্গে তো সাক্ষাৎ হল না। তারা কোথায়?

নিশ্চয়ই ডাকবাংলোর অপর দিকে গা ঢাকা দিয়েছে। উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় রয়েছে। থাক্‌গে, তাদের কথা পরে ভাবব। আগে এই বেইমানটার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিই।

"চৌকিদার····· চৌকিদার······" দরজায় ধাক্কা দিতে থাকি।

"কৌন্ হ্যায় ?" সাড়া দিয়েছে। "বেটা! আ গয়া ? আও বেটা, আও।"

ব্যাপার কী ? কাকে বেটা বলছে ? তবে কি সে তার নিজের ছেলেকে এই রাহাজানিতে নিযুক্ত করেছে ? কতবড় মিথ্যাবাদী এই শয়তানটা! কাল কথায় কথায় বলেছে তার একমাত্র ছেলে নাকি আজ বিশবছর নিরুদ্দেশ।

"আও বেটা, আও।" দরজা খুলে টলতে টলতে বাইরে বেরোয় চৌকিদার, "আ গয়া ? কেঁও এত্‌না দের কিয়া ? আও, বেটা, আও।" বলেই সে সহসা আমাকে জাপটে ধরে। আমার হাত থেকে লাঠি ও টর্চ পড়ে যায়।

ইস্, কি শয়তান লোকটা। বড়ই বেকায়দায় ফেলেছে। মুখে কিন্তু এখনও সেই এক বুলি, "বেটা, হামারা বেটা। তু আ গযা · আ গয়া।"

কঠিন বন্ধনে সে বেঁধে ফেলেছে আমাকে। কায়দা করে ছেলেকে জানিয়ে দিচ্ছে আমি এসে গেছি। আর ভাবার সময় নেই। ঝটকা মেরে নিজেকে মুক্ত করে নিই। মুখ থুবড়ে পড়ে যায় চৌকিদার। একটু বেসামাল হয়ে পড়ে। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। আবার উঠে দাঁড়ায়। টলতে টলতে এগিয়ে আসে আমার দিকে। মুখে সেই এক বুলি, "আও বেটা, আও।"

না আর অপেক্ষা করা উচিত হবে না। এই শেষ সুযোগ। লাঠিটা হাতে তুলে নিই। চৌকিদার কাছে আসতেই সজোরে তাকে আঘাত করি। আর্তনাদ করে সে আবার মাটিতে পড়ে যায়। এবারে আর উঠতে পারে না। সে কাতরাতে থাকে।

উত্তেজনায় আমার হাত-পা কাঁপছে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। তবু আমাকে অবিচলিত থাকতে হবে। আক্রমণ আসন্ন। আমি

চৌকিদারের দিকে চোখ রেখে চারিদিকে লক্ষ্য রাখি। কয়েক মিনিট কেটে যায়। কিন্তু কোথায়? কেউ নেই, কিছু নেই।

সহসা কাতরানি থামিয়ে চৌকিদার কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে, "মহারাজ, মাফ কিজিয়ে। হামরা গলত্ হো গয়া।"

আমাকে অবিচলিত থাকতে হবে।

ডাকবাংলোর ভেতরে একটা শব্দ হল। তাহলে ওরা এতক্ষণে ভেতরে ঢুকে পড়েছে? কাজ হাঁসিল করছে? আমি বাধা দেব। আমি একা। তাহলেও কাপুরুষের মত এই দস্যুবৃত্তি মেনে নেব না। চৌকিদারের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত। তাকে আরও কিছুক্ষণ এখানে পড়ে থাকতে হবে। টর্চটা কুড়িয়ে নিয়ে, লাঠি হাতে ছুটে চলি ডাকবাংলোর দিকে। দরজার কাছে এসে গতি কমাই। পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকি। টর্চ জ্বালাই।

একি! মানুষ নয়, মূষিক। কম করেও দশ-পনেরোটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইঁদুর সারা ঘরে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। আলো জ্বালতেই চোখের পলকে এদিকে ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কাল সকালে খাবার জন্য যে রুটি ক'খানি টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছিলাম, সেগুলো সারা ঘরে ছড়ানো। থালাখানিও মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ঐ থালা পড়ে যাবার শব্দ শুনেই ছুটে এসেছি। কোথায় সশস্ত্র দস্যুদল আর কোথায় পলায়মান মূষিককুল!

সভ্যতার নিষ্পেষণে সহজ চিন্তা মুছে গেছে মন থেকে। গভীর নিশীথে কোন শব্দ হলে যে চোর-ডাকাত ছাড়া আর কিছু হতে পারে, এ ধারণাই মনে আসে না।

কিন্তু চৌকিদারকে কি কৈফিয়ত দেব? কৈফিয়তের কথা পরে হবে। আগে তো তাকে সুস্থ করে তুলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যাক।

আবার ছুটে আসি চৌকিদারের কাছে। না, এখনও অজ্ঞান

হয়ে যায় নি, তবে শীতে কাঁপছে, কথা জড়িয়ে গেছে। বিড়বিড় করে বলছে, "হামারা গলত্ হো গয়া···গলত্ হো গয়া।"

"চৌকিদার!" আমি ডাক দিই। সে বোধহয় শুনতে পায় না। আবার ডাকি।

এবারে উত্তর দেয়, "জী!" চোখ মেলে তাকায়। তারপরেই কেঁদে ওঠে। "মহারাজ, হামরা গলত্ হো গয়া।"

লজ্জায় ঘৃণায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়। অনেক কষ্টে সংযত করি নিজেকে। তারপর দুহাতে চৌকিদারকে কোলে তুলে নিই। সে প্রতিবাদ করতে চায়, কিন্তু আমি আমল না দিয়ে তাকে বয়ে নিয়ে আসি ডাকবাংলোয়। শুইয়ে দিই আমার খাটিয়ায়। বাইরের দরজা বন্ধ করে একটু ব্রাণ্ডি খাইয়ে দিই। ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বালাই। তারপর এসে বসি ওর পাশে। আমার একখানি হাত দুহাতে জড়িয়ে ধরে আবার সে কেঁদে ওঠে। একই কথা বলতে থাকে, "মহারাজ, হাম্ মাফি মাংতা। হামারা গলত্ হো গয়া।"

"তোমার নয় চৌকিদার। আমারই ভুল হয়েছে। তুমি আমায় মাফ কর।"

সে প্রতিবাদ করে ওঠে। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বলতে থাকে, "আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, সে এসেছে। স্বপ্নের মধ্যে আপনার ডাক শুনেছি। ঘুমের ঘোরে দরজা খুলে আপনাকে সামনে পেয়ে ভেবেছি আমার শেষ জীবনের স্বপ্ন বুঝি বা সত্য হল। কিন্তু হায়, সব মিথ্যে। যা হবার নয়, তা কি কোনকালে হয়?" একবার থামে চৌকিদার। অশ্রুসিক্ত চোখদুটি মুছে নিয়ে আবার বলে, "গত বছর শীতের সময় আলমোড়ায় গিয়েছিলাম। দোস্তদের কথামত একজন বড় জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন সে ফিরে আসবে। সেই থেকে সারাদিন আমি তার

পথ চেয়ে থাকি। সারারাত ঘুমোতে পারি না। কেবলই স্বপ্ন দেখি আর পদধ্বনি শুনি। দরজা খুলে ছুটে বাইরে এসে দেখি—কেউ নেই, কিছু নেই। কেবল তুষার-ছোঁয়া হিমেল হাওয়ার মাতামাতি।

কিন্তু জ্যোতিষীর কথা তো মিথ্যে হতে পারে না। তবে সে কবে আসবে মহারাজ? আমি ততদিন থাকবো তো?" করুণ চোখে সে আমার দিকে তাকায়।

কী জবাব দেব? কে আসবে তাই জানি না, কবে আসবে সে প্রশ্নের উত্তর আমি দেব কেমন করে? বলি, "তুমি একটু চুপ করে শুয়ে থাক চৌকিদার। সুস্থ হয়ে নাও। আমি ততক্ষণে চায়ের জলটা চড়িয়ে দিই।"

"আমি সুস্থ হয়েছি মহারাজ। আপনি বিশ্রাম করুন। আমি চা বানাচ্ছি।" সে তাড়াতাড়ি খাটিয়া থেকে নেমে পড়তে চায়।

আমি ধমক লাগাই, "তোমাকে চা বানাতে হবে না। যা বলছি, তাই কর। চুপচাপ শুয়ে থাক।"

"তাতে যে আমার পাপ হবে মহারাজ। অনেক পাপ করেছি এ জীবনে। পাপের বোঝা বাড়াতে চাই না।" তার কণ্ঠে অনু-শোচনার পরশ।

কিন্তু আমি তাতে বিচলিত না হয়ে জলের কেটলিটা ফায়ার-প্লেসের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে বলি, "আগে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক চৌকিদার। তারপরে তোমার পাপের কথা ভাবা যাবে।"

"না মহারাজ। সে যে কত বড় পাপ, তা আপনি ধারণা করতে পারবেন না। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। আর তাই সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, তাই সে ফিরে আসছে না।"

"সে কে? তুমি কার প্রতীক্ষায় রয়েছ?"

"আমার ছেলে—একমাত্র ছেলে—একমাত্র সন্তান। আমার বংশরক্ষক।"

"কেন সে চলে গেছে?"

"আমি খুনী বলে।"

"খুনী?"

"হ্যাঁ মহারাজ। আমি খুনী। আমি তাকে খুন করেছি।" চৌকিদারের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। বিস্ময়ে ও ভয়ে আমিও বাক্য-হীন হয়ে যাই। খানিকক্ষণ নীরবে কেটে যায়। তারপর সে আবার বলে ওঠে, "আমি তাকে মেরে ফেলেছি। আমার পনেরো বছরের ছেলের সামনে তার মাকে আমি মেরে ফেলেছি।"

"কেন?"

নিজের কপাল দেখিয়ে দেয় চৌকিদার, "নসীব মহারাজ, নসীব।" তারপরে কান্না-জড়ানো সুরে বলতে থাকে সে-কাহিনী—

বিশ বছর আগে। চৌকিদার এত শান্ত-শিষ্ট আর ধার্মিক ছিল না যৌবনে। লাখনৌ-এর বিখ্যাত ভাড়াটে গুণ্ডা ছিল সে। কিন্তু তার স্ত্রী ছিল বড়ই শান্তশিষ্ট আর ধার্মিক। চৌকিদারকে খুব ভালবাসত সে। তাকে পাপ পথ থেকে ফেরাতে কত চেষ্টা করত। কত করে বোঝাত আর কেবলই চৌকিদারের হাতে মার খেত। মাতাল ও দুশ্চরিত্র স্বামীর সকল অত্যাচার সে হাসিমুখে সহ্য করত। গুণ্ডামীর মুনাফার অধিকাংশই চৌকিদার ঢালতো মদ ও মেয়েমানুষের পেছনে। স্ত্রীকে যা দিত, তাতে তিনটি প্রাণীর খাওয়া-খরচ কুলতো না। তবু সে কোনদিন কোন অনুযোগ করে নি। বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে রুটি যোগাড় করেছে, ছেলেকে স্কুলে পড়িয়েছে, আর স্বপ্ন দেখেছে ছেলে বড় হবে, ছেলের মধ্যেই সে ভুলে থাকত স্বামীর সকল অবিচার। তবে ছেলেকে সব সময়েই আগলে রাখত, বাপের কাছ ঘেঁষতে দিত না। ছেলেও হয়েছিল ঠিক তেমনি। সর্বদা বাপকে এড়িয়ে চলত। এ নিয়ে চৌকিদার কোনদিন মাথা ঘামায় নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন

ছেলেকে দেখে সে মুগ্ধ হল। বেশ বাড়ন্ত গড়ন, বয়সকালে খু জোয়ান হবে। বাপের নাম রাখতে পারবে। সে লুব্ধ হল।

কথায় কথায় চৌকিদার সেদিন রাতে কথাটা বৌকে বলল। আর শুনেই সে আতকে উঠল। যা কোনদিন করে নি তাই করল। চৌকিদারের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে উঠল, 'না না, সে আমি কিছুতেই হতে দেব না। তোমার সব অত্যাচার আমি সয়েছি। কিন্তু তুমি ওর দিকে হাত বাড়াতে চেও না। সে আমি সহ্য করব না।'

'তোর বাপ করবে। কালই আমি ওকে আড্ডায় নিয়ে যাব। লেখাপড়া শেখাচ্ছে। গুণ্ডার ছেলে পণ্ডিত হবে।' চৌকিদার গর্জে উঠেছে।

'তাই হবে। ক'মাস বাদেই ওর পরীক্ষা। তার পরেই আমি ওকে নিয়ে চলে যাব তোমার এই পাপপুরী থেকে।'

'কি বললি? আমি পাপী?' চৌকিদার লাফ দিয়ে খাটিয়া থেকে নামে, 'আমি এখনই নিয়ে যাব। দেখি কে আটকায়।'

ছেলে দাওয়ায় বসে পরীক্ষার পড়া তৈরি করছিল। সে ওদের চীৎকার শুনে, দরজা খুলে, আলো হাতে ঢোকে। চৌকিদার ছুটে গিয়ে ছেলের হাত ধরে। বলে, 'চল্ আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?' ছেলে বিস্মিত হয়।

'আড্ডায়।'

'আমার প্রাণ থাকতে তা তুমি পারবে না।' মা এগিয়ে আসে।

'তাহলে তোকে সেই প্রাণই দিতে হবে।' ওরা কিছু বোঝার আগেই চৌকিদার সজোরে লাথি মারে তার পেটে। সে ছিটকে মাটিতে পড়ে যায়। তার গলা থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরিয়ে আসে। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। তারপরই সব চুপচাপ।

ছেলে ছুটে গিয়ে মা-র মাথার পাশে বসে পড়ে। আকুল কণ্ঠে ডাকতে থাকে, 'মা, মা, মা···'

মা ছেলের দিকে তাকায়। স্বামীর দিকে তাকায়। কি যেন বলতে চায়, কিন্তু পারে না। সে চোখ বোজে, ঘুমিয়ে পড়ে। সে ঘুম আর কোনদিন ভাঙে নি।

"তারপর ?" উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করি।

চৌকিদার তার সজল চোখ দুটি মুছে নিয়ে বলে, "ভেবেছিলাম পুলিসের কাছে গিয়ে ধরা দেব। কিন্তু ছেলে আমাকে যেতে দেয় নি। সারারাত সে মায়ের পাশে বসে রয়েছে। ভোর হতেই আমাকে সেখানে বসিয়ে, পাড়াপড়শীদের খবর দিয়েছে, মিথ্যে কথা বলেছে, কাল রাতে জ্বরের ঘোরে তার মা খাটিয়া থেকে পড়ে গেছে। দুর্বল শরীরে সে আঘাত সইতে পারে নি। হার্টফেল করেছে। নিজেই বলে-কয়ে এক ডাক্তারকে দিয়ে লিখিয়ে এনেছে যে তার মা-র স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।"

"ছেলে তাহলে কবে তোমাকে ছেড়ে চলে গেল ?" প্রশ্ন করি চৌকিদারকে।

"সেদিনই। শ্মশানের সব কাজ মিটে যাবার পর আর তাকে খুঁজে পাই নি। কেউ আর তাকে লাখ্‌নৌতে দেখেনি।" ডুকরে কেঁদে ওঠে চৌকিদার।

কাঁদতে কাঁদতেই বলে, "কিন্তু সে বেঁচে আছে। আমার মন বলছে, সে বেঁচে আছে। সে বড় হয়েছে। সে মানুষ হয়েছে। তার মা-র স্বপ্ন সফল করেছে। তাই আমি গত বছর আলমোড়ায় গিয়েছিলাম। এক জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়েছিলাম। তিনি বলেছেন—সে আসবে। আমাকে বাবা বলে ডাকবে। কিন্তু সব মিথ্যে। বৃথাই আমার এই প্রতীক্ষা। সে আর আসবে না মহারাজ। কেন আসবে ? মাতৃ-হত্যাকারীকে কি কেউ

কোনদিন ক্ষমা করতে পারে? আমার আর প্রায়শ্চিত্ত করা হল না।"

আগুনটা কখন নিভে গেছে। আঁধারে ছেয়ে গেছে ঘর। কালরাত্রি এখনও কাটে নি।

বাইরে কিসের শব্দ? কেউ যেন দরজা ধাক্কাচ্ছে, ছুটে যাই দরজার কাছে। তাড়াতাড়ি খিল খুলি। দরজাটা আপনা থেকেই খুলে যায়। কেবলি তুষার-ছোঁয়া হিমেল হাওয়ার মাতামাতি। কেউ নেই, কিছু নেই।



শূন্য শূন্য নয়

আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন সেন সাহেব। তারপর সই করলেন—আই. সেন। ব্যাস্; সব শেষ।

কিন্তু কেন শেষ করলেন সেন সাহেব? বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্-এর সঙ্গে তো তাঁর মনোমালিন্য হয় নি। প্রফুল্লচিত্ত স্বাস্থ্যবান ইন্দ্রজিৎ সেন। দেহে ও মনে কোন ক্লান্তি আসে নি তাঁর। তবে কেন? কেউ জানে না। সবাই চমকে উঠবে এ সংবাদ পেয়ে।

ইন্দ্রজিৎ সেনও সেদিন চমকে উঠেছিলেন। অমন চমক আসে না সবার জীবনে। আজকের সেন সাহেব সেদিন এই কোম্পানির একজন নগণ্য কর্মচারী—চেয়ারম্যান সার্ হ্যারল্ড অ্যাটকিন্সন-এর ফাইলিং-কাম্-ডেসপ্যাচ ক্লার্ক। তখনও চাকরির হালচাল ঠিক বরদাস্ত হয় নি। কাজকর্মে ভুল হল। বড় সাহেব কিছু না বললেও পি. এ. সাহেব ও স্টেনো মেমসাহেবের ধমকানিতে অস্থির। নিজেকে বড়ই ছোট মনে হত। কেবলই ভয় হত, চাকরি বুঝি যায়।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল সার হ্যারল্ড ফার্লো নিচ্ছেন। ইন্দ্রজিৎ সেনের মুখ শুকিয়ে গেল, বুক টিপটিপ করতে লাগল। ভয়ে ভয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন বড়সাহেবের চেম্বারে।

"ইয়েস্। এনি আর্জেন্ট কেব্ল্?"

"নো সার।" একটু চুপ করে থাকেন ইন্দ্রজিৎ। তারপর বললেন, "সার্! আমার একটা আবেদন আছে।"

"স্পিক আউট্ মাই চাইল্ড।"

"আপনি ছুটিতে গেলে আমিও ছুটি নেব।"

বড়সাহেব তাঁর দিকে তাকালেন। কি যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "ও. কে.। অ্যাপ্লাই।"

ছুটি নিলেন সার্ হ্যারল্ড। তিনি সপরিবারে যাবেন পর্বতময় উত্তর-ইংল্যাণ্ডের কেস্‌উইক্। আর ইন্দ্রজিৎ একা চললেন হিমালয়ের দিকে। হরিদ্বারে কয়েকদিন কাটিয়ে এলেন ঋষিকেশ। উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ। ঘুরতে ঘুরতে একদিন বিকেলে এসে উপস্থিত হলেন লছমনঝুলার সামনে। ঝুলা পেরিয়ে পাহাড়ের গা ছুঁয়ে চললেন স্বর্গাশ্রমের দিকে। ওপার জনবহুল, এপার জনবিরল। ওপারে গার্হস্থ্য, এপারে বানপ্রস্থ। দুয়ের মাঝে গঙ্গা—জীবনগঙ্গা। দু তীরেই আঘাত করছে অবিরত।

মন্দির ছাড়িয়ে আম্রকুঞ্জের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রজিৎ চললেন হেঁটে। মাঝে মাঝে গঙ্গার তীরে সাধুদের কুঠিয়া—পাতার তৈরি, হাওয়ায় দুলছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন ইন্দ্রজিৎ সেন। পাতার নয়, পাথরের একটি কুঠিয়া। সামনে সরু বারান্দা। ধীর পদক্ষেপে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন তিনি। সৌম্যদর্শন একজন মধ্যবয়সী সন্ন্যাসী ভেতরে বসে বই পড়ছিলেন। তাঁর পরনে গেরুয়া। মুণ্ডিত মস্তক, দাড়ি গোঁফ কামানো, বই থেকে চোখ তুলে সন্ন্যাসী তাকলেন তাঁর দিকে। তাকিয়ে হাসলেন। সহজ সতেজ সাবলীল মধুর হাসি। কেমন একটা মাদকতা আছে সে হাসিতে —আছে সম্মোহনী শক্তি। ইন্দ্রজিৎ এগিয়ে এলেন দোরগোড়ায়। প্রশ্ন করলেন সন্ন্যাসী, "আজই বুঝি প্রথম এলে এদিকে?"

"হ্যাঁ।"

"ভেতরে এসো।"

জুতো খুলে ভেতরে ঢোকেন ইন্দ্রজিৎ। পরিষ্কার ঝকঝকে মেঝে। পরিচ্ছন্ন বিছানা—গেরুয়া চাদরে ঢাকা। ইন্দ্রজিৎ

বসলেন বিছানার ওপরে। সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু খাবে ?"

"প্রথমেই খাবার কথা বলছেন কেন ?"

"তুমি ক্ষুধার্ত বলে।"

ইন্দ্রজিৎ চুপ করে থাকেন। সন্ন্যাসী উঠে গিয়ে ঘরের এক কোণে রাখা হাঁড়ির ভেতর থেকে কয়েকটা কিসমিস ও আখরোট এনে তার হাতে দিলেন।

ইন্দ্রজিতের হাসি পেল। এটুকু খেয়ে কতটুকু ক্ষিদে মিটবে ? তা হলেও বিনা প্রতিবাদে খেয়ে ফেললেন। খেয়েই কিন্তু তাঁর একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। মনে হল এইমাত্র যেন ভূরিভোজ সেরে উঠেছেন তিনি। বিস্মিত ইন্দ্রজিৎ কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই একটি খরমুজ হাতে ঘরে ঢুকলেন গেরুয়াধারী একজন লোক। তাঁর খালি পা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, অবিন্যস্ত চুল, মাঝারি গড়ন, ফর্সা রং, চোখ দুটি ঘোলাটে। খরমুজটি সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে রেখে তিনি তাঁকে প্রণাম করলেন। সন্ন্যাসী বললেন, "প্রণাম নিলাম, কিন্তু প্রণামী নিতে পারব না।"

"আমাকে উদ্ধার করুন।" ভদ্রলোক হাত জোড় করে রইলেন।

"তা হলেন ওটা প্রণাম নয়, ঘুষ ? কিন্তু আপনাকে তো কালই বলেছি, দীক্ষা দেবার যোগ্যতা আমার নেই।"

ভদ্রলোক কানে আঙুল দিলেন। সন্ন্যাসী উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। কিন্তু সে হাসি দীর্ঘস্থায়ী হল না। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, "জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়ে কাপুরুষের মত পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ? কিছুদিন থাকুন এখানে। মন শান্ত হোক। তারপর ফিরে যাবেন সংসারে। সন্ন্যাসী না হয়েও এখানে বাস করা যায়।"

"সব বন্ধন ছিন্ন করে এসেছি। আমি তো আর ঘরে ফিরব না স্বামীজী। আপনি আমাকে দয়া করুন।"

"বেশ। রোজ এখানে আসুন। গল্প করা যাবে। এই তো এই ছেলেটি এসেছে।" সন্ন্যাসী ইন্দ্রজিৎকে দেখিয়ে দেন, "আমি খুশি হয়েছি। এরকম আরও অনেকে আসে। কিন্তু তারা কেউ আপনার মত দীক্ষা নিতে চায় না।"

ভদ্রলোক ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তারপরে সহসা সন্ন্যাসীর পা দুখানা জড়িয়ে ধরলেন, "দোহাই আপনার! আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না।"

সন্ন্যাসী নির্বাক, নিথর, নিস্পন্দ, নিরুদ্বিগ্ন। অপলক নয়নে চেয়ে রইলেন সচল গঙ্গা, অচল হিমালয় আর কুয়াশামুক্ত সুনীল আকাশের দিকে। হয়তো ভাবছেন এই বিচলিত বিষণ্ণ সংসারীর মনের আকাশে বন্ধনের কুয়াশা কেটেছে কি না।

ইন্দ্রজিৎ নির্বাক, তিনি দর্শক।

কিছুক্ষণ বাদে সন্ন্যাসী বলে উঠলেন, "বেশ আপনার কথাই রাখবো। তবে একটি শর্তে।"

"কী?" ভদ্রলোক ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন। সন্ন্যাসীর পা ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন।

"ঠিক একমাস বাদে আমার কাছে আসবেন। এই একমাস ঋষিকেশে থেকে সন্ন্যাস-জীবনকে জানতে হবে। তারপরে আমাকে বলবেন—যে সংসারকে আজ আপনার শূন্য বলে মনে হচ্ছে সে কি সত্যিই শূন্য? মনে রাখবেন, আপাত দৃষ্টিতে যা শূন্য বলে মনে হয়, তা সত্যই শূন্য নয়। জিরো ইজ এ নাম্বার।"

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে হাসি। বললেন, "আমি তাহলে আসি।"

"আসুন, তবে ঐ খরমুজটি নিয়ে যান।"

"গুরুদেব ··"

"এ আমার আদেশ।"

ভদ্রলোক নিঃশব্দে তাঁর ভাবী গুরুদেবের আদেশ পালন করলেন।

হেসে ইন্দ্রজিৎ বলেন, "আপনি বোধহয় হেরে গেলেন স্বামীজী।

"না

"কেন ?"

"একমাসের মধ্যেই ভদ্রলোক ঋষিকেশ ছেড়ে পালাবেন ."

"কেমন করে বুঝলেন ?"

"অভিজ্ঞতা থেকে। সংসারের কঠিন বাস্তবকে বরদাস্ত করতে না পেরে অনেকেই সংসার ত্যাগ করতে চায়। এও এক রকমের শখ। সংসারকে তখন শূন্য বলে মনে হয়। ভুলে যায় শূন্য থেকেই পূর্ণতা আসে! দুঃখ পেয়ে যারা সন্ন্যাসী হয় তারা সন্ন্যাসী হয়েও দুঃখ পায়। আর সে দুঃখ সংসারের সব দুঃখের চেয়ে অনেক বড়।"

"তবে আপনি কেন সন্ন্যাসী হয়েছেন ?"

"আমি তো সন্ন্যাসী নই। সংসারের সব কাজ মিটিয়ে তবে আমি এখানে এসেছি।"

"কেন এসেছেন ?"

"হিসেব মেলাতে। ডেবিট ক্রেডিট মিলিয়ে জীবনের ব্যালেন্স শিট তৈরি করছি।"

"এ যুগে তার কি কোন প্রয়োজন আছে ?"

"আগে নিয়ম ছিল পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ। এ প্রয়োজন আজও আছে। তবে পঞ্চাশ নয়, ষাট। তার বেশি আর সংসারে

থেকো না। আমার মত এমনি কোন নির্জন জায়গায় এসে জীবনের হিসেব মিলিও। দেখবে শান্তি পাবে।"

থামলেন সন্ন্যাসী।

চুপ করে রইলেন ইন্দ্রজিৎ। চারিদিকে স্বর্গীয় নীরবতা। পাখির কূজন আর গঙ্গার গর্জন—ওরা যেন এই নীরবতারই অংশ?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সন্ন্যাসী আবার বললেন, "তোমাকে দেখেও মনে হচ্ছে জীবনযুদ্ধে পরাজয়ের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ তুমি। এর চেয়ে বড় অপরাধ আর নেই। তোমার মধ্যে এক বিরাট কর্মশক্তির বীজ লুকিয়ে রয়েছে। লোভের কাছে, মোহের কাছে হার না মেনে কাজ করে যাও। নতুন ভাবে ভেবো, নতুন পথে চলো—সফলতা আসবেই।"

সেইদিনই ইন্দ্রজিৎ রওনা হলেন কলকাতায়। কলকাতা পৌঁছেই অফিসে এলেন। ছুটি তখনও ফুরোয় নি। অবাক হলেন বড় সাহেবকে দেখে। তবে কি সার হ্যারল্ড ছুটিতে যান নি?

গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে এডেন থেকে ফিরে আসতে হয়েছে। একটা জালিয়াতির ষড়যন্ত্র চলছিল। কোম্পানির কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী সহ স্বয়ং পি. এ. সাহেব জড়িত ছিলেন এই ষড়যন্ত্রে।

বড় সাহেবও অবাক হলেন তাঁকে দেখে। যেন স্বর্গ হাতে পেলেন। বললেন, "চারিদিকে বিশ্বাসঘাতক। ভগবানকে ডাকছিলাম! তিনিই তোমাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

চমকে উঠলেন ইন্দ্রজিৎ সেন। সেই সন্ন্যাসী কে? ইন্দ্রজিৎ যে তাঁর আদেশেই ফিরে এসেছেন।

ইন্দ্রজিৎ সেনের জীবনের পরবর্তী চল্লিশ বছরের ইতিহাস বাংলার শিল্পজগতের এক গৌরবময় অধ্যায়। অথচ ইন্দ্রজিৎ জানেন এই সুদীর্ঘকাল তিনি শুধু কায়মনোবাক্যে সেই সন্ন্যাসীর আদেশ পালন করে গেছেন। সাফল্য নিজে এসে তাঁর গলায় জয়মাল্য দিয়েছে পরিয়ে। পি. এ. থেকে সেক্রেটারি, সেক্রেটারি থেকে ডাইরেক্টার, ডাইরেক্টার থেকে চেয়ারম্যান। সেই সাফল্যময় কর্মজীবনে আজ যতি পড়ল।

আজ সকালেও কিন্তু এ কথা ভাবেন নি ইন্দ্রজিৎ সেন। আজ যে তাঁর জন্মদিন এ কথা মনে ছিল না সেন সাহেবের। কিন্তু মনে ছিল ইন্দ্রাণীর—শিল্পপতি ইন্দ্রজিৎ সেনের বিদূষী ও বুদ্ধিমতী জীবন-সঙ্গিনী। কোনদিনই কোন ভুল হয় না তাঁর। অফিস নিয়ে মেতে থাকেন সেন সাহেব। আর হুঁশিয়ার কাণ্ডারীর মত সংসার-তরণীর হাল ধরে থাকেন ইন্দ্রাণী। মেয়ের বিয়ে থেকে ছেলেকে বিলেত পাঠানো—সব ব্যবস্থাই করতে হয় ইন্দ্রাণীকে। আজ অফিসে বের হবার মুখে সহসা ইন্দ্রজিৎকে প্রণাম করলেন তিনি। নতুন ফ্যাক্টরিতে কবে প্রোডাকশান শুরু করতে পারবেন, মনে মনে তার দিন স্থির করছিলেন সেন সাহেব। বিরক্ত হয়ে তিনি তাকালেন ইন্দ্রাণীর দিকে।

"বারে! আজ যে তোমার জন্মদিন। আজ তুমি একষট্টি বছরে পড়লে।"

চমকে উঠলেন ইন্দ্রজিৎ সেন। ষাট বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাহলে তো জীবনের হিসেব মেলবার সময় সমাগত।

কাজের ভিড়ে সেন সাহেবের খেয়াল না থাকলেও বন্ধু-বান্ধব ও কর্মচারীবৃন্দের ভুল হয় নি। তাঁরা দলে দলে তাঁর চেম্বারে এসেছেন, দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন, অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি কাউকে কিছু বলেন নি। সকলের শুভেচ্ছা হাসিমুখে

গ্রহণ করেছেন। প্রতিবারের মত আজও তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে সকাল সকাল অফিস ছুটি হয়ে গেছে। দারোয়ান ও খাস বেয়ারা ছাড়া সবাই চলে গেছেন। শুধু সেন সাহেব রয়েছেন বসে। তারপর সহসা তিনি বাইরের লাল আলোটা জ্বালিয়ে দিয়েছেন। ও আলো জ্বালালে কেউ ঢুকতে পারে না তাঁর চেম্বারে। বুঝতে হবে অত্যন্ত জরুরী কাজে ব্যস্ত রয়েছেন তিনি। জরুরী বৈ কি! জীবনের সবচেয়ে জরুরী কাজ করছেন সেন সাহেব। নিজ হাতে নিজের পদত্যাগপত্র টাইপ করেছেন।

কাল সকালে সবাই যখন জানতে পারবেন, শিল্পপতি ইন্দ্রজিৎ সেন অপ্রত্যাশিতভাবে পদত্যাগ করে হিমালয়ের পথে যাত্রা করেছেন, তখন তাঁরা ভাববেন তিনি পূর্ণ থেকে শূন্যের পথে পা বাড়িয়েছেন। কিন্তু সত্যই কি তাই?

সহমরণ

"এই সেই সমাধি।"

"কার? স্বামীজীর?"

"হ্যাঁ। আর এটি হল লালুর।" ঠাকুরজী দেখিয়ে দেন।

নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকি। পাথরে বাঁধানো ছুটি সাধারণ বেদী। একটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং উঁচু। ছুটির এখানে-ওখানে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ঘাস গজিয়েছে। তাহলেও বড়টি মাঝে মাঝে মানুষের হাতের স্পর্শ পায়। সন্ধ্যাদীপও বোধ করি জ্বালানো হয়। কারণ সমাধির সর্বোচ্চ ধাপে একটি তেল-সলিতাহীন মাটির প্রদীপ পড়ে আছে। আর কয়েকটি শুকনো ফুল।

ছোটটি বোধ করি বহুদিন মানুষের হাতের পরশ পায় নি। তাই আগাছায় ছেয়ে গেছে। না সবই আগাছা নয়। কয়েকটি বনফুলের গাছও আছে ওদের মধ্যে। তাতে ফুল ফুটেছে। তাজা রঙীন ফুল।

মানুষ ভুলে গেছে লালুকে। কিন্তু প্রকৃতি তাকে ভোলে নি। সে যে প্রকৃতিরই সন্তান। অনন্ত প্রকৃতির মধ্যেই তার জন্ম, তার জীবন, তার মৃত্যু। তবে হ্যাঁ, সে মানুষের ভালবাসা পেয়েছিল। একজন মানুষ। এই শিব-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা— স্বামীজী। সেই অপার প্রেমের মর্যাদা রেখেছে লালু। নিজের জীবন দিয়ে স্বামীজীর স্নেহের মূল্য দিয়ে গেছে।

"বেলা পড়ে এল। আমার পূজোর যোগাড় করতে হবে। চলুন মন্দিরে যাওয়া যাক।"

"আপনি যান। আমি বরং একটু বসি। যাবার সময় দেখা করে যাব।"

ঠাকুরজী চলে যান। পাথর-বাঁধানো প্রশস্ত প্রাঙ্গণ পেরিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন। পরিষ্কার প্রাঙ্গণ। ছায়াশীতল। পাশেই প্রকাণ্ড একটি অশ্বত্থ গাছ। তার বিশাল শাখায় মন্দির-প্রাঙ্গণ ও এই সমাধি দুটিকে ঢেকে রেখেছে। গাছ এখানে চারিদিকেই। ছোট বড় শাল, শিমুল, শিশম আর মানুষ-সমান উঁচু দেবদারু। এখন অবশ্য আর বন বলা উচিত নয়। বন ছিল সেকালে। কিন্তু সেকালের কথা এখন থাক। এখন বন কেটে বসত হয়েছে। বসতি এগিয়ে এসেছে প্রায় মন্দির পর্যন্ত। বীরভদ্রপুরের অ্যান্টি-বায়োটিক কারখানার শ্রমিকরা গড়ে তুলেছে এই উপনিবেশ। হিংস্র শ্বাপদ-শঙ্কুল অরণ্য আজ শিশুদের কলহাস্যে মুখরিত।

তবে মন্দিরটির তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। প্রায় তেমনি রয়েছে প্রাঙ্গণের মাঝখানে স্লেট পাথরের টালি দিয়ে ছাওয়া পাথরের ছোট মন্দির। ভেতরে শিবলিঙ্গ। মনুষ্যনির্মিত নয়। এই শিবলিঙ্গ পাওয়া গেছে প্রায় চল্লিশ বছর আগে—হরিদ্বার ঋষীকেশ রেললাইন তৈরি করার সময়। তখন কেদার-বদ্রী ও গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী যাত্রীদের হরিদ্বার থেকেই হাঁটাপথ শুরু হত। তীর্থযাত্রী ও জনসাধারণের সুবিধার জন্যে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কম্পানি হরিদ্বার-দেরাদুন রেলওয়ের রায়ওয়ালা স্টেশন থেকে ঋষীকেশ পর্যন্ত এই বারো কিলোমিটার পথে রেললাইন প্রসারিত করা শুরু করেন। প্রায় সমস্ত জায়গাটা জুড়েই রাণীপোখরী কুখ্যাত জঙ্গল—মানুষখেকো বাঘ সাপ হায়না হনুমান ময়ূর প্রভৃতি নানা ধরনের পশুপক্ষীর আবাস। প্রস্তরময় দুর্গম চড়াই উৎরাইকে সমতল করার সময় কর্মরত শ্রমিকরা কুড়িয়ে পেলেন এই শিবলিঙ্গ। কথাটা রটে গেল চারিদিকে। কিন্তু কে

এই মনুষ্য-বর্জিত গহন বনে শিবপূজা করতে আসবেন? শ্রমিকরা রেললাইনের ধারে শিবলিঙ্গটি রেখে নিজেদের কাজে মন দিলেন।

একদিন তাঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন, সেই গহন বনের বুক চিরে বেরিয়ে আসছেন একজন গেরুয়াধারী। স্বামীজী এসে থামলেন সেই শিবলিঙ্গের কাছে। বিস্মিত শ্রমিকরা গাঁইতি ফেলে ছুটে গেলেন সেখানে। প্রণাম করলেন স্বামীজীকে। আশীর্বাদ করে স্বামীজী বললেন, 'ওহ্ পিপলকে পেড়কে নীচে এক কুঠিয়া বানা দো। ম্যয় ওহি ইয়ে শিবলিঙ্গকী প্রতিষ্ঠা করুঙ্গা।'

'মগর স্বামীজী, রোজানা পূজা কী বন্দোবস্ত ক্যয়েসে হোগা?'

'কেঁও? ম্যায় করুঙ্গা।'

'তব তো আপকো এহি রহনে হোগা।'

'রহুঙ্গা।'

সেই থেকে স্বামীজী এখানে ছিলেন—আমরণ। শ্রমিকদের নির্মিত এই মন্দিরেই মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি। আর আজ তাঁরই সমাধি-ক্ষেত্রে বসে আছি আমি।

মন্দির ঠিক তেমনিই আছে, কোন পরিবর্তন হয় নি। তবে তাঁর কুঠিয়াটির সংস্কার-সাধন করা হয়েছে। এখন এটি ঠাকুরজীর বাসগৃহ। আর পরিবর্তন হয়েছে প্রকৃতির। জনপদ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বনচররা এ অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে। এখন আর এখানে আসতে ভয়ের কিছু নেই। অনেকেই পূজো দিতে আসেন হৃষীকেশ ও বীরভদ্রপুর থেকে। কাজেই ঠাকুরজী বেশ ভালই আছেন। স্বামীজীও খারাপ ছিলেন না।

বিশ বছর আগে। তখনও এদিকটা জনমানবশূন্য। হৃষীকেশ থেকে একটা সরু পায়ে-চলা পথ দিয়ে এই মন্দিরে পৌছতে হত। দিনের বেলাও প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করে এ পথে চলতে হত। তবে মাঝে মাঝে দু-এক দল পুণ্যার্থী সকালের দিকে এ মন্দিরে

পূজো দিতে আসতেন। আবার রোদ থাকতে ফিরে যেতেন ঋষীকেশ। তাদের এক হাতে থাকত পূজোর থালা, আরেক হাতে লাঠি কিংবা বল্লম।

তাঁদেরই একজনের কাছে আমি শুনেছিলাম এই মন্দিরের কথা—স্বামীজীর কথা। সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করে এক শীতের অপরাহ্নে, কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে লাঠি হাতে রওনা হয়েছিলাম, এই বনমন্দিরের উদ্দেশে।

ঋষীকেশ স্টেশন রোড থেকে এই বনমন্দিরের দূরত্ব প্রায় দেড় মাইল। স্টেশন রোড ছাড়িয়েই উদ্বাস্তু উপনিবেশ। আমার গন্তব্যস্থলের কথা শুনে ওরা বিস্মিত হলেন। একা আমাকে মন্দিরে যেতে নিষেধ করলেন—ভয় দেখালেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমার অটল সঙ্কল্পের পরিচয় পেয়ে পথ দেখিয়ে দিতে বাধ্য হলেন।

উদ্বাস্তু উপনিবেশের পরেই বহুদূর বিস্তৃত ঘন ঘাসবন—টাইগার গ্রাস। দৈর্ঘ্য প্রায় ফুট সাতেক। কাজেই কেবল বাঘ কেন, হাতি ছাড়া অন্য যে-কোন প্রাণী অনায়াসে আত্মগোপন করে থাকতে পারে। এবং সুযোগ বুঝে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সেই ঘাসবনের ভেতর দিয়ে একটি আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথরেখা ধরে আমি এগিয়ে চললাম।

পথরেখাটি আঁকড়ে থাকা বড়ই কঠিন। কারণ আমাকে ঘাস সরিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। ঘাসের আঁচড় লাগছে আমার সর্বাঙ্গে। অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের ঘাসগুলো মিশে গিয়ে আমার সামনে ও পেছনে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করছে।

মাঝে মাঝেই তৃণাচ্ছাদিত বড় বড় পাথরের চাঁই। আমি ক্রমাগত হোঁচট খাচ্ছি। দু-একটি পাখি শোঁ-শোঁ করে শিস্ দিতে-দিতে আমার মাথার ওপর দিয়ে আসা-যাওয়া করছে। তাদের

দিকে নজর দিতে গিয়ে এক সময় কোন ফাঁকে যেন পথরেখাটি পালিয়ে গেছে। চিন্তায় পড়লাম—এই অজানা অচেনা ঘাসবনে কি করে আবার হারানো পথ খুঁজে পাই।

পেয়েছি, অনেক বুদ্ধি খরচ করে। প্রথমে ঘাস সরিয়ে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত টিহরী গাড়োয়ালের প্রাক্তন রাজধানী নরেন্দ্রনগরকে খুঁজে বার করি। তারপর অনুমানে পথ ঠিক করে আবার চলতে শুরু করি বনমন্দিরের দিকে। অনুমান বৃথা হয় নি। কিছুক্ষণ চলার পর পথরেখা খুঁজে পেয়েছি।

কিন্তু নিশ্চিন্তে পথ চলার অবকাশ নেই। হঠাৎ একটা একটানা ছড়ছড় শব্দ কানে এসেছে। মনে হয়েছে সে আসছে। কে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় নি। আমি সঙ্গীহীন, আমি অসহায়। কিন্তু কাপুরুষ নই। তাই লাঠি হাতে রুখে দাঁড়াই সেই ঘাসবনে। চারিদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে প্রতীক্ষা করি তার আক্রমণের। প্রতিটি মুহূর্তকে এক একটা প্রহর বলে মনে হয়। তবু তার প্রতীক্ষা করি।

বিরামবিহীন সেই একটানা ছড়ছড় শব্দের ছেদ নেই। কিন্তু কোথায় সে? আরও কিছুক্ষণ কেটে যায় প্রবল শীতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে থেকেও আমা. গা দিয়ে ঘাম ঝরার বিরাম নেই। কেবলই ভাবছি, এই আসে, ওই আসে। কিন্তু কোথায় সে? শেষ পর্যন্ত সে এল না।

এলে কি হত তা জানি না। আজ হয়তো স্বামীজীর এই সমাধিতলে বসে থাকার সুযোগ .তাম না। তবে এল না বলে তখন আমার মনটা বেশ ভারী হয়ে উঠেছিল।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে চেষ্টা করেছিলাম শব্দের কারণটা আবিষ্কার করতে। অনেকক্ষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে বুঝতে পারলাম বনচর নয়—বনের হাওয়া। বাতাসের ঘায়ে ঘাসগুলো মূর্ছা

যাচ্ছিল। একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়ছিল। আর সেই ঢলাঢলির ফলে ঐ ছড়ছড় শব্দ।

এক সময় ঘাসবন শেষ হল, শুরু হল পাইন আর দেবদারুর সারি। তাদের মাঝে কিছু শাল ও শিমুল। বনের পাতা ঝরে বনপথকে ঢেকে রেখেছিল। সেই শুকনো পাতা সরিয়ে পথ খুঁজে নিয়ে আমাকে পৌঁছতে হয়েছিল এখানে। আমি এসেছিলাম এই মন্দিরে, দেবানুগ্রহ লাভ করতে নয়, স্বামীজীর আকর্ষণে—মহামানব-দর্শনে।

দর্শনলাভ করেছিলাম। শুকনো পাতার শব্দে সচকিত হয়ে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন মন্দির-প্রাঙ্গণে। আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসেছিলেন কাছে। কিন্তু কোন কথা বলেন নি। আমি তাঁকে প্রণাম করে বললাম, 'আপনাকে দেখতে এলাম স্বামীজী।'

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই বয়সে তোর এই উৎকট শখ কেন হল রে?'

চুপ করে রইলাম। কেমন করে বলি যে আমি জনশ্রুতির সত্যতা যাচাই করতে এসেছি। কিন্তু তিনি বোধকরি অন্তর্যামী। একটু মৃদু হেসে বললেন, 'আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছিস?'

আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম। তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'আমি ভারী খুশি হয়েছি। এই তো মানুষের ধর্ম। সত্যকে যাচাই করে নিতে হয়।' একবার থামলেন তিনি। তারপরে আমার একখানি হাত ধরে বললেন, 'আয় আমার সঙ্গে।'

আমাকে নিয়ে এলেন মন্দিরে। জানালাহীন ছোট মন্দির। ভিতরটা অন্ধকার। শিবলিঙ্গের পাশে একটি প্রদীপ জ্বলছে। তবু আঁধার ঘোচে নি। একখানি পাথরের থালায় সামান্য কিছু ফল।

বুঝলাম তখনও পুজো হয় নি। মাঝে মাঝে দু-একদল পুণ্যার্থী এইসব ফল দিয়ে যান। তবে তাঁরা সকালে এসে দুপুরের আগেই ঘরে ফিরে যান। কেউই আমার মত বিকেলে আসেন না এখানে। সকালে এলেও আমি স্বামীজীর দর্শন পেতাম। স্বামীজী সব সময়ে এখানেই থাকেন। কিন্তু আমি তো কেবল স্বামীজীকে দর্শন করতে আসি নি। আমি যে লালুকেও দেখতে এসেছি। শুনেছি সন্ধ্যে না হলে নাকি তার দেখা পাওয়া যায় না। তাই আজ আমাকে এখানে রাত্রিবাস করতে হবে।

স্বামীজীর ঘরের পেছন দিয়ে একটি ক্ষীণ জলধারা বয়ে যাচ্ছে। তারই শীতল সুমিষ্ট জলে হাত-মুখ ধুয়ে তৃষ্ণা মেটালাম। তার পরে এসে বসলাম মন্দিরে। স্বামীজী পুজোর যোগাড় করতে করতে বললেন, 'এসেছিস তো আমাকে যাচাই করতে। কিন্তু দেখিস, পরে যেন আবার ভয় পাস নে।'

'ভয় পাব কেন? আপনি তো রয়েছেন।'

'তাহলে আমার ওপর তোর কিছু বিশ্বাস আছে? আমাকে বিশ্বাস করলে নির্ভয়ে থাকতে পারিস। নইলে তার মত অবস্থা হবে।'

'কার মত স্বামীজী?'

'সেই যে সেবারে পুজো দিতে এসেছিল। কি নাম যেন··· লছমীনারায়ণ। পথ ভুল করে, সারাদিন ঘাসবনে চক্কর খেয়ে সন্ধ্যের আগে কোনমতে এখানে এসে পৌঁছয়। তখন আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই রাতটা কেটে গেল এখানে। তারপরে সে কি কাণ্ড। লালুকে দেখেই অজ্ঞান। আর এদিকে লালু তো সেই অস্থির। আমি অবশ্য তাকে ধমকে দিলাম। কিছুক্ষণ বাদে লছমীনারায়ণের জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু সে রাতে লালু অ[illegible] দোরগোড়ায় শুতে পারল না। তাকে চত্বরে বসে রাত

কাটাতে হল। তাতেও কি লছমীনারায়ণের ভয় কমে? সে সারারাত আমাকে জড়িয়ে ধরে জেগে রইল।'

সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল স্বামীজী পুজোয় বসলেন। ধীরে ধীরে চারিদিক গহন আঁধারে ছেয়ে গেল। শব্দহীন অরণ্য ক্রমে ক্রমে শব্দমুখর হয়ে উঠল। শুকনো পাতার ওপর কারা যেন পদচারণা করছে। তারা কারা জানি না। তবে মানুষ নয় মানুষের মিত্রও নয়। তাহলে এই নিরস্ত্র বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, এই শত্রুপুরীর মধ্যে কেমন করে বেঁচে আছেন?

পুজো করতে করতে স্বামীজী হঠাৎ বলে উঠলেন, ওপারে উঠিস নে। ঐখান থেকেই প্রণাম কর।'

কার সঙ্গে কথা বলছেন স্বামীজী। এখানে তো তৃতীয় প্রাণী নেই। কিন্তু পেছন ফিরেই আমার ভুল ভাঙল। ভয়ে চিৎকার করে উঠি, 'স্বামীজী!' তাঁকে জড়িয়ে ধরতে যাই।

স্বামীজী ধমক লাগালেন, 'একটু আগে দেখি বললি, ভয় পাবি না। আমি তো এখানেই রয়েছি।'

বলেছিলাম নেহাত বলতে হয় বলে। তখন কি বুঝেছিলাম যে বাহাদুরী দেখাবার ফল এমন হাতে-নাতে পেতে হবে? তবে বোঝা উচিত ছিল। ঋষীকেশে সবাই বলেছেন—স্বামীজী যেমন সত্য, লালুও তেমনি মিথ্যে নয়। তাদের কথা বিশ্বাস করি নি। তাই এসেছি এখানে। আসার আগে একবারও ভাবি নি, কথাটা সত্য হলে আমার কি দশা হবে।

স্বামীজী সামনে রয়েছেন। তবু আমার বুক ধড়ফড় করছে। সারা শরীরে একটা কম্পন দেখা দিয়েছে। দেহ অসাড় হয়ে যেতে চাইছে। আমিও কি লছমীনারায়ণের মত অজ্ঞান হয়ে যাব নাকি? তাহলে স্বামীজী যে সবার কাছে আমার গল্পও বলবেন।

মনে বল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকি। ভাবি, ভয় পাবার কি আছে। লালু যাই হোক, সে স্বামীজীর অনুগত। কোনমতে আবার সেদিকে তাকাই। বিস্ময়ের সীমা থাকে না। লালু তার বিরাট দেহটাকে এলিয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। সত্যই তাই। তারপরে সে উঠে দাঁড়ায়। চত্বরের সিঁড়ির নিচে দুপায়ে ভর করে, বেড়ালের মত বসে পড়ে। তার সঙ্গে চোখোচোখি হয়। চোখ নয়, যেন অগ্নিপিণ্ড, অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আমি স্বামীজীর গা ঘেঁষে বসে থাকি।

কিছুক্ষণ বাদে পূজারত স্বামীজী শাঁখটি আমার দিকে ঠেলে দিয়ে ইশারায় বাজাতে বলেন। নিজে ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি শুরু করেন। আমি শঙ্খধ্বনি করি। সঙ্গে সঙ্গে লালু উঠে দাঁড়ায়। স্বামীজী যতক্ষণ আরতি করেন, সে দাঁড়িয়ে থাকে। আশ্চর্য !

আমি মাঝে মাঝেই তাকে আড়চোখে দেখে নিচ্ছি। সে কিন্তু একবারও আমার দিকে তাকাচ্ছে না। নাগালের মধ্যে মানুষ পেয়ে বনের বাঘের এই নির্লিপ্ততা বিস্ময়কর। কিন্তু বিস্ময়পর্বের তখনও অনেক বাকি ছিল।

অবশেষে গাল বাজিয়ে করতালি দিয়ে স্বামীজী পূজা শেষ করেন। ডাক দেন, 'লালু! আয়, প্রসাদ নিয়ে যা।'

সিঁড়ি বেয়ে চত্বর পেরিয়ে লালু উঠে আসে মন্দিরে। আমার ঠিক পেছনে এসে দাঁড়ায়। স্বামীজী কয়েকটি ফল হাতে নিতেই সে হাঁ করে। আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

তার মুখে প্রসাদ দিতে গিয়ে স্বামীজীর লক্ষ্য হয়। তিনি হাত নামিয়ে নিয়ে ধমকে ওঠেন, 'তুই আবার মুখ না ধুয়ে মন্দিরে এসেছিস ?'

লালু মুখ বন্ধ করে। নতমস্তকে বসে পড়ে। ওর ভাবভঙ্গি দেখে আমার হাসি পায়। কিন্তু আমি হাসতে পারি না।

স্বামীজী আবার ধমক লাগান, 'এখানে বসে পড়লি কেন? যা, শিগ্‌গীর মুখ ধুয়ে আয়।'

লালু এক লাফে নিচে নামে। অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। স্বামীজী লালুর প্রসাদটুকু আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'নে।'

আমি বনের বাঘের খাবারটুকু হাতে নিয়ে স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করি, 'ওর মুখে কিসের রক্ত লেগেছিল? মানুষের নয় তো?'

'না, না। লালু আমার মানুষখেকো নয়। বনমোরগ, ছাগল, ভেড়া, হরিণ-টরিণ মেরে খায় হয়তো। তবে ঠিক বলতে পারি না। লালু কখনও তার শিকার নিয়ে এখানে আসে না।'

হঠাৎ আমার ঘাড়ের ওপর কার যেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। চমকে পেছন ফিরি। আমার গলা শুকিয়ে আসে। লালু যেন কখন এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে আমার পেছনে। যদি নিশ্বাসের বদলে তার একখানি থাবা এসে পড়ে আমার পিঠে, তাহলে কি হবে?

কিন্তু আমি যে একটু এগিয়ে বসব তার উপায় নেই। ছোট মন্দির, সামনেই পুজোর উপকরণ, তারপরেই শিবলিঙ্গ। কাজেই কম্পিত বক্ষে কোনমতে বসে থাকি সেখানে। স্বামীজী আপন মনে তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন। আমি আড়চোখে লালুর দিকে তাকাই। লালু বসে পড়েছে। দু-পায়ে ভর করে চোখ বুজে বসে আছে। ঠিক ভক্ত যেভাবে বসে ভগবানের সামনে। লালু হয়তো ভাবছে দেবাদিদেব মহাদেবের কথা। কিন্তু আমি ভাবছি লালুর কথা। ভাবছি আর দেখছি। সাধারণ বাঘ—যেমনটি এ অঞ্চলে হয়। কম করেও ছ-সাত ফুট লম্বা হবে। গায়ের রংটা লালচে বাদামী। সারা গায়ে খয়েরী ডোরা। গোঁফগুলো বেশ লম্বা।

মাঝে মাঝে মুখটা ফাঁক করছে—লক্‌লকে জিভ আর দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে।

যতই দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি। মানুষ বাঘকে বশ মানায়, সার্কাসে দেখছি। কিন্তু সেখানে সে বন্দী থাকে বন্ধ খাঁচায়। শক্তিমান ট্রেনার, ব্যাটারী বসানো হান্টার হাতে নিয়ে খাঁচা খুলে দেয়। বাঘের খেলা দেখায়। খেলা-শেষে আবার তাকে পুরে রাখে খাঁচায়।

আর এখানে? পোষ-মানা বন্দী বাঘ নয়, বনের স্বাধীন বাঘ। হান্টার হাতে শক্তিমান ট্রেনার নয়, নিরস্ত্র দুর্বল এক সন্ন্যাসী।

একসময় স্বামীজীর কাজ শেষ হল। তিনি পুনরায় প্রণাম করলেন দেবাদিদেব মহাদেবকে। সঙ্গে সঙ্গে লালু মাটিতে মাথা ঠেকালো। আমিও তার দেখাদেখি মাথা নত করলাম।

স্বামীজী খানিকটা প্রসাদ নিলেন হাতে। লালু তার বিরাট মুখখানি হাঁ করল। স্বামীজী ফল ক'টি ফেলে দিলেন তার মুখে। সে চিবোতে চিবোতে নেমে গেল মন্দির থেকে।

আমিও স্বামীজীর সঙ্গে নেমে আসি নিচে। মন্দিরের দোর বন্ধ করে তিনি এলেন তাঁর বাসগৃহে। এখন ঐ ঘরে ঠাকুরজী বাস করছেন। তবে তখন ঘরখানির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। বহু বছর আগে রেলের শ্রমিকরা তৈরি করে দিয়েছেন এই কুটিয়া। তারপরে আর কোন সংস্কার হয় নি। চালের অবস্থা ভাল নয়। তবে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে, দরজাটি একেবারেই ভাঙা। এই ভয়ঙ্কর অরণ্যে স্বামীজী একা কেমন করে বাস করেন এই ঘরে?

শেষ পর্যন্ত তাঁকে কথাটা না জিজ্ঞেস করে পারি না। তিনি হেসে জবাব দেন, 'তোর বুঝি ভয় করছে?'

চুপ করে থাকি। স্বামীজী ভরসা দেন, 'ভয় নেই রে। তুই

খেয়ে নিয়ে নির্ভয়ে শুয়ে পড়। লালু থাকতে তোর কোন ভয় নেই। সে সারারাত শুয়ে থাকে দোরগোড়ায়। একটা পাতা পড়ার শব্দ হলে ছুটে যায় সেখানে। ওর ভয়ে কোন জন্তুর সাধ্য আছে আমাদের চতুঃসীমায় আসে। তবে মানুষ এলে লালু কিছু বলে না। সে জানে মানুষ মানেই আমার আত্মীয়। লালুই তো বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে। কি বলিস রে?' স্বামীজী লালুর দিকে তাকান। সে কি বোঝে কে জানে। তবে একটা বিকট শব্দ করে। আমি কেঁপে উঠি, স্বামীজী হেসে ওঠেন।

'ওকে আপনি পেলেন কোথায়?'

'কেন? এই বনে। সে অনেক দিন আগেকার কথা। রেলের শ্রমিকরা আমাকে এই মন্দির ও ঘর তৈরি করে দিল। কিন্তু নিষেধ করল এখানে বাস করতে। অথচ এখানে না থাকলে নিয়মিত পুজো চলবে না। ঠাকুর অভুক্ত থাকবেন। পথের অবস্থা তো তুই দেখেছিস। তখন আরও দুর্গম ছিল। রোজ হৃষীকেশ থেকে যাতায়াত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া যাতায়াতের পথেও তো ভবলীলা সাঙ্গ হতে পারে। তাই এখানেই বাস করা মনস্থ করলাম। ঘরের দরজাটা অবশ্য তখন ভাল ছিল। দরজা বন্ধ করে ভয়ে ভয়ে রাত কাটাতাম। দিনের বেলাও যে নির্ভয়ে থাকতাম, তা নয়। ভয়টা কিন্তু কেটে গেল কিছুদিন বাদে। কিন্তু জীবনটা মোটেই নিরাপদ ছিল না। এই সময় একদিন ফুল আনতে বনে ঢুকেছি। দেখি একটা বাঘের বাচ্চা ছুটোছুটি করছে। কোন বড় বাঘ নেই আশে-পাশে। বুঝতে পারলাম শিকারীরা যে বাঘদুটি মেরে নিয়ে গেছেন, এটি তাদেরই সন্তান। বড় ভাল লাগল বাচ্চাটাকে। 'আয় আয়', বলতেই সে আমার কাছে এল। দু-হাতে তাকে কোলে তুলে নিলাম। সে আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে চুপ করে রইল। নিয়ে এলাম মন্দিরে। একটু দুধ

ছিল, তাই খেতে দিলাম। খেয়ে নিয়ে সে মহানন্দে লেজ দোলাতে লাগল। ভাবলাম, থাক না এখানে। যখন ওর মন চাইবে, চলে যাবে বনে। কিন্তু পরদিন সকালে উঠে দেখি সে ঘুমিয়ে আছে মন্দির-চত্বরে। আমি ডাক দিতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসল, ছুটে এল আমার সামনে। তেমনি ভাবে লেজ নাড়াতে শুরু করল।

'লালু সেই থেকে আছে আমার কাছে। আমাকে ও আগলে রেখেছে সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে। সে আমার কথা বুঝতে পারে। কখনও অবাধ্য হয় না।' একবার থামেন স্বামীজী, 'সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী আমি। মাঝে মাঝে ভাবি, কেন এই বিচিত্র স্নেহের জালে জড়িয়ে পড়লাম। আর ক'দিনই বা বাঁচব? কিন্তু আমি মরে গেলে লালুর কি হবে? তখন কে দেখবে ওকে?' স্বামীজীর চোখদুটি সজল হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি। 'লালুকে কি খেতে দেন?'

'কি আর দিতে পারি? ফলমূল, দু-চারখানা রুটি, মাঝে-মধ্যে একটু দুধ।'

'কিন্তু তাতে কি ওর পেট ভরে?'

'না। ও এখন অনেক বড় হয়েছে। খিদে বেড়েছে। ঐ-টুকুতে ওর পেট ভরবে কেমন করে? তাই তো আমি ওকে বলেছি দিনের বেলা গিয়ে কিছু মেরে-টেরে খেতে।'

'ও তাহলে রোজই বনে যায়। আর আপনি তখন একাই এখানেই থাকেন।'

'তা থাকি। তবে কি জানিস? লালু কখনই দূরে যায় না। কাছাকাছি থাকে। মাঝে মাঝে আমাকে এসে দেখে যায়। অন্য কোন মানুষ থাকলে কিন্তু আর চত্বরে আসে না। নিশ্চিন্ত হয়ে বনে ফিরে যায়।'

আমাদের খাওয়া শেষ হলে স্বামীজী একখানি থালায় করে খান চারেক রুটি ও একটু দুধ রাখলেন লালুর সামনে। পরিতোষ সহকারে খাবারটুকু নিঃশেষ করে সে শুয়ে পড়ল কপাটবিহীন দরজার সামনে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় তার গায়ের গন্ধ নাকে আসছে।

কিছুক্ষণ বাদেই স্বামীজীর নাসিকা-গর্জন কানে এলো। কয়েক-বার দপদপ করে প্রদীপটা নিভে গেল। বাইরের ঘন আঁধার ছুটে এসে আমাদের ডুবিয়ে দিল। অসীম আঁধারের মধ্যে ডুবে থেকে আমি আলোর আশায় প্রহর গুনতে থাকলাম।

এতক্ষণ বোধ করি খেয়াল করি নি, এবারে নানা ধরনের শব্দ ও প্রতিশব্দ কানে আসতে শুরু করল। ঘরের ভেতরে ও বাইরে জোনাকি ও ঝিঁঝি পোকার মেলা বসেছে। জোনাকিরা জ্বলছে নিভছে, বসছে উড়ছে। ঝিঁঝিরা একটানা ডেকে চলেছে—কাকে কে জানে ? কিন্তু কেউ তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে না।

না, দিচ্ছে বই কি। ঐ যে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি শিরশির শব্দ। শুকনো পাতার ওপরে কেউ যেন বুকে ভর করে এগিয়ে আসছে।

না, আসছে না। শব্দটা থেমে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা শব্দ—মাটিতে নয় আকাশে। একটা অস্থির ডানা ঝটপটানির শব্দ। একটা বাদুড় বোধ করি বিরক্ত হয়ে এক শাখা থেকে আরেক শাখায় গিয়ে বসল। তারপরেই চারিদিক সচকিত করে একপাল শেয়াল উঠল ডেকে। শিউরে উঠলাম। উঠে বসতে গিয়ে বসতে পারলাম না। সাহস পেলাম না। নজর পড়ল দরজার দিকে। বাইরের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে লালু। ঘুমিয়ে পড়েছে কি ? কে জানে ? আর ঘুমোলেই বা ওর জাগতে কতক্ষণ। অন্ধকারে ওরা পরিষ্কার দেখতে পায়। জেগে উঠে যদি আমি বসে আছি, তাহলে নির্ঘাত সে আমার প্রতি

মনোযোগী হয়ে পড়বে। স্বামীজী অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আমি একা।

শীতের রাণীপোখরী। নিশ্চয়ই খুব শীত পড়েছে। কিন্তু আমার সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে। গা থেকে স্বামীজীর দেওয়া কম্বলখানি সরিয়ে রাখি নিঃশব্দে। আস্তে আস্তে সময় চলে বয়ে।

ঝিঁঝির ডাক কখন যেন গিয়েছে থেমে। হয়তো ওরাও পরিশ্রান্ত হয়ে স্বামীজীর মতই পড়েছে ঘুমিয়ে। কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। আমি রয়েছি জেগে। কেমন একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে চারদিকে। যেমনটি দেখা যায় ঠিক কালবৈশাখীর পূর্বক্ষণে।

সহসা বনের বাতাস উঠল কেঁপে। শান্ত অরণ্য অশান্ত হয়ে উঠল। শুরু হল ময়ূরের ডাক, বাঁদরের কিচিরমিচির, হায়নার হাহাকার আর বাঘের গর্জন। অন্ধকারের বুক চিরে বাতাসে ভর করে, তারা আমার কানের পর্দায় আগুনের উত্তাপ বয়ে নিয়ে এল।

লালু উঠে দাঁড়িয়েছে। একটা ঘড়ঘড় শব্দ করছে। চাপা অথচ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কাকে যেন শাসাচ্ছে। স্বামীজীর ঘুম ভেঙে গেছে। তিনি ধমক দিলেন লালুকে 'তোকে একশো বার বলেছি না আমি ঘুমোলে কোন শব্দ করবি না। চুপ করে বসে থাক ওখানে।'

লালু আবার শুয়ে পড়ে সেখানে।

আমাকে বসে থাকতে দেখে স্বামীজী বলেন, 'লালু বুঝি তোর ঘুমটাও ভেঙে দিল?'

'আজ্ঞে না। আমি এখনও ঘুমোতে পারি-নি। ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিই।

'কেন? নতুন জায়গা বলে? চোখ বুজে চেষ্টা কর, ঘুম আসবে।'

স্বামীজী চোখ বোজেন। আমি চুপ করে থাকি। কি বলব। কেমন করে বোঝাই, চেষ্টায় সব কাজ হয় না। চেষ্টা করলেই শিবপুজোর জন্য আমি এই শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে নির্ভয়ে বাস করতে পারি না। চেষ্টা করলেই আমি একটি ব্যাঘ্রশিশুকে অপত্য-স্নেহে লালন-পালন করে, তার সঙ্গে সংসার করতে পারি না। চেষ্টা করলেই আমি এই পরিবেশের মধ্যে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারি না।

তবে চেষ্টা করে মনে মনে দুর্গা নাম জপতে জপতে, সেই ভয়ঙ্কর রাতটা কোনমতে কাবার করে দিয়েছিলাম। পরদিন সকালে স্বামীজীকে প্রণাম করে লালুর দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে বিদায় নিয়েছিলাম এখান থেকে। পূর্বপুরুষদের পুণ্যের ফলে পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে গিয়েছিলাম ঋষীকেশ।

"একি, আপনি এখনও এখানে বসে রয়েছেন? রাত হয়ে গেল যে। তাহলে আজ আর কি ফিরে যাবেন? থেকে যান আমার সঙ্গে। অসুবিধে হবে না কোন। একা একা থাকি। আজ তবু একটু গল্প করা যাবে।"

ঠাকুরজীর কথায় বাস্তবে ফিরে আসি। সত্যিই তো চারিদিকে কখন যেন আঁধার নেমে এসেছে। আমি বসে আছি স্বামীজীর সমাধিতলে। আঁধার বসে বিশ বছর আগের এক আঁধার রাতের কথা ভাবছিলাম। এদিকে কখন যে গোধূলির পরে সন্ধ্যে হয়েছে, সন্ধ্যের পর রাত হয়েছে, টের পাই নি। আমি সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির স্মৃতির মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম।

তবে এখন আর এ সময়ে এখানে বসে থাকতে ভয় নেই কোন। এখন সন্ধ্যা সমাগমে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা নেমে আসে না এখানে।

গহন বনের বাতাস আর তার অধিবাসীদের ঐকতানে দূরের পাহাড় কেঁপে ওঠে না। যাদের চরণভারে সেদিন ধরণী টলমল করত, তারা আজ বিদায় নিয়েছে এখান থেকে। বিদায় নিয়েছেন স্বামীজী, বিদায় নিয়েছে লালু—তারা বিদায় নিয়েছে এ জগৎ থেকে।

সেই বিচিত্র বিদায়ের কাহিনী শুনতে চাইলাম ঠাকুরজীর কাছে। তিনি বললেন, "মন্দিরে চলুন। পুজোটা সেরে নিই। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে শুয়ে সে কাহিনী বলব আপনাকে।"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। আমারও বেশ খিদে পেয়েছে। ঠাকুরজীর সঙ্গে মন্দিরে আসি।

শিবপুজোয় হাঙ্গামা নেই কোন। নিরহঙ্কারী ব্যাঘ্রচর্মধারী তপস্যাচারী ভোলানাথের পুজো—তার আবার নিয়ম-অনিয়ম কি? স্মরণ ও মনন করে মাথায় এক ঘটি জল আর একটি বেলপাতা দিলেই হল। ছটাক খানেক দুধ দিতে পারলে তো কথাই নেই। মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

কাজেই কিছুক্ষণের মধ্যেই শিবপূজা সাঙ্গ হল। মন্দির বন্ধ করে ঠাকুরজী তাঁর ঘরে চললেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করি।

আর একজনের সঙ্গে এমনি এক নিশুতি রাতে এই ঘরে এসেছিলাম। সেদিন আর এদিন। সেদিন লালু ছিল সঙ্গে। আজ লালু নেই। স্বামীজী নেই। কিন্তু আছে সেই মন্দির, আছে এই ঘর, আছি আমি।

ঘরের অবশ্য অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মজবুত কাঠের কপাট লেগেছে দরজায়। মেঝেটাও মেরামত করা হয়েছে। পাথরের দেয়াল চুনকাম করেছে। প্রথমে প্রসাদ ও পরে রুটি ও ভাজি খেয়ে নিলাম। তারপর জাঁকিয়ে বসলাম ঠাকুরজীর কম্বলে।

ঠাকুরজী শুরু করেন, "সে এক বিচিত্র পিতৃভক্তির কাহিনী। সকরুণ কাহিনী। দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করতে হচ্ছে আমাকে। স্বামীজী ছিলেন মৃত্যুভয়হীন। নইলে সে আমলে আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে তিনি একা এখানে পড়ে থাকতে পারতেন না। তাঁর অপমৃত্যু সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সে মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক বিচিত্র পিতৃভক্তির কাহিনী। মানুষের জন্য এক হিংস্র পশুর অবিশ্বাস্য আত্মোৎসর্গের ইতিহাস।"

"সে ইতিহাস আমার একেবারে অজানা নয় ঠাকুরজী। তবু আপনার মুখ থেকে আমি তা শুনতে চাই। আর তাই আজ আমি এসেছি এখানে।"

"সে এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যা। যথারীতি সেদিন সকালে লালু বেরিয়ে গেছে বনে। স্বামীজী জানতেন নতুন বাস-পথ তৈরি হচ্ছে বনের ভেতর দিয়ে। মাঝে মাঝে ডিনামাইট ফাটিয়ে পথ সমতল করা হচ্ছে। তাই সে অঞ্চলের যত জন্তু-জানোয়ার এ অঞ্চলে এসে আস্তানা গেড়েছে। তবু তিনি লালুকে ধরে রাখেন নি। বলতে গেলে তিনি তাকে কিছুই খেতে দিতে পারেন না। দিনের বেলাও যদি সে শিকার করতে না পারে, তাহলে তার শরীর টিকবে কেমন করে? তবে সেদিন যাবার আগে তাকে বলে দিয়েছিলেন—দিনকাল ভাল নয় রে, পারলে একটু সকাল সকাল আসিস।

"কিন্তু সেদিন লালু দিনের আলো থাকতে মন্দিরে ফিরে এল না। সাধারণত বলে দিলে সে সকাল সকাল ফিরে আসে। তবু স্বামীজী চিন্তিত হন নি। ভেবেছেন—শিকারের সন্ধানে সে দূরে চলে গিয়েছে। তাই তার ফিরতে দেরি হচ্ছে।

"কিন্তু বড় বেশি দেরি হচ্ছে যে। সন্ধ্যে হয়ে গেল তবু ফিরে

এল না। স্বামীজীর একটু রাগ হল লালুর ওপর। ভাবলেন— আজ এলে একটু ভাল করে ধমকে দিতে হবে।

"স্বামীজী পুজোয় বসলেন। ঘণ্টাধ্বনিতে মন্দির মুখরিত হয়ে উঠল। পুজো প্রায় শেষ হয়েছে। এমন সময় প্রাঙ্গণে শুকনো পাতার ওপরে একটা খস্‌খস্‌ আওয়াজ হল। লালু আসছে। স্বামীজী খুশী হলেন, নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু পেছন ফিরে তাকালেন না। মনে যাই থাক, মুখে রাগ দেখাতে হবে তিনি আপন মনে পুজো করে চললেন।

"শব্দটা আরও এগিয়ে আসছে। লালু এসে গেছে মন্দির-চত্বরে। তবু তিনি পেছন ফেরেন না। আপনমনে পুজো করে চলেন।

"তারপরে...

"হ্যাঁ, তার মুহূর্তখানেক পরেই সমস্ত পৃথিবীটা যেন স্বামীজীর পিঠের ওপর ভেঙে পরে। লালু তাঁকে আক্রমণ করেছে! তাঁর পিঠে থাবা বসিয়েছে। ঘাড়টা কামড়ে ধরেছে। অকৃতজ্ঞ পশু। যে তোকে নিজের জীবনের চেয়ে ভালবাসত, তুই তার রক্ত পান করলি। বেইমান এই ছিল তোর মনে? সবাই স্বামীজীকে বলেছে এই কথা। তিনি তাঁদের কথা শোনেন নি। তাই লালুর হাতেই আজ তাঁর মৃত্যু হল।

"না, লালু নয়। লালু, বনের বাঘ, হিংস্র পশু। কিন্তু সে বেইমান নয়, অকৃতজ্ঞ নয়। তাই সে নিজের জীবন দিয়ে তার কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করে গেছে।

"স্বামীজী মুখ থুবড়ে পড়ে যান শিবলিঙ্গের সামনে। বাঘটা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। আর ঠিক তখনই বজ্রগম্ভীর গর্জনে লালু কোথা থেকে এসে লাফিয়ে পড়ে তার ঘাড়ে। প্রাণের পশু আর বনের পশুর মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়ে যায়। বনের বাঘটা কেবলই আসতে চায় স্বামীজীর কাছে আর লালু তাকে

ঠেকিয়ে রাখে সর্বশক্তি দিয়ে। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রলয়কাণ্ড চলতে থাকে। কেউ কম নয়। এই লালু তার ওপরে উঠেছে, একটু পরেই সে আবার লালুর ওপর চড়ছে। দুজনেই গড়াগড়ি যাচ্ছে। উভয়েই উভয়কে ক্ষত-বিক্ষত করছে। বাঘটা লালুর চাইতে বড়। তার গায়েও জোর বোধ করি বেশি। কিন্তু লালুর মনের জোর অনেক বেশি। সে প্রতিহিংসা-পরায়ণ, সে ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত। নিজের যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়ে সে ক্রমাগত আঘাত হানে তার পালক-পিতার আততায়ীকে।

"স্বামীজী অসহায়। লালুকে সাহায্য করার কোন শক্তি নেই তাঁর। ক্ষতস্থান থেকে দর দর করে রক্ত ঝরছে। দেহ ক্রমেই অসাড় হয়ে আসছে। তিনি চোখে অন্ধকার দেখছেন। তবু কোনমতে তিনি লুপ্তপ্রায় জ্ঞানটুকু বজায় রাখলেন।

"ওদের সংগ্রাম তখনও চলেছে। মরণপণ সংগ্রাম। শত্রু শেষ না হলে এ সংগ্রাম শেষ হবে না। তখন বোধকরি আততায়ী ভুলে গেছে স্বামীজীর কথা। সে আর তার দিকে এগিয়ে আসতে চাইছে না। কেবলই আঘাত করছে লালুকে। লালুও পালটা আঘাত হানছে। ওদের গর্জনে চারিদিক প্রকম্পিত হচ্ছে। বনের পশু-পক্ষীর নিদ্রা গেছে টুটে। দলে দলে পাখি এসে আশ্রয় নিয়েছে অশ্বত্থগাছের ডালে। কিন্তু পশুরা কেউ এল না কাছে। এটা লালুর এলাকা। তার ভয়ে দিনে কিংবা রাতে কেউ আসে না এদিকে। তারা দূর থেকে কেবল শব্দ শোনে।

"পরদিন সকালে লাঠি ও বল্লম নিয়ে একদল পুণ্যার্থী এলেন মন্দিরে। এসে দেখলেন এক ভয়াবহ দৃশ্য। সমস্ত প্রাঙ্গণ রক্তাক্ত —মানুষ নয়, বাঘের রক্ত। আর সেই রক্তাক্ত প্রাঙ্গণে পড়ে আছে একটা অতিকায় বাঘ।

"মন্দিরের অবস্থা আরও ভয়াবহ। ফুল-বেলপাতা প্রসাদ-

নৈবেদ্য—সব একাকার। থালা-বাসন কাঁসর-ঘণ্টা প্রদীপ-কমণ্ডলু —সব চুরমার। সমস্ত মেঝেটায় রক্ত দানা বেঁধে আছে—বাঘের নয়, মানুষের রক্ত। স্বামীজী পড়ে আছেন সেখানে। নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন, কিন্তু জ্ঞান হারান নি।

"তাড়াতাড়ি ধরাধরি করে তাঁকে বাইরে নিয়ে এলেন পুণ্যার্থীরা। যথাসাধ্য শুশ্রূষা করলেন। ঋষীকেশ থেকে ডাক্তার এলেন। তিনি ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়ে ওষুধ খাওয়ালেন। একটু সুস্থ হলেন স্বামীজী। ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—লালু কোথায়?

"ওঁরা মৃত বাঘটিকে দেখিয়ে দেন।

– লালু মারা গেছে? চিৎকার করে উঠতে চান স্বামীজী।

"সবাই নত মস্তকে বসে থাকে। স্বামীজীর দু'চোখে অশ্রুর প্রবাহ নেমে আসে। মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করেও যাঁর চোখে একফোঁটা জল গড়ায় নি, লালুর মৃত্যু-সংবাদ শুনে তিনি শিশুর মত কেঁদে উঠলেন। বিচিত্র বাৎসল্য।

"কিছুক্ষণ বাদে স্বামীজী বললেন—আমাকে তোমরা লালুর কাছে নিয়ে চল। আমি শেষবারের মত ওকে একটু দেখে নিই।

"তখন তাঁকে নাড়াচাড়া করা ঠিক নয়। তবু আমরা ধরাধরি করে নিয়ে এলাম লালুর মৃতদেহের পাশে। তিনি খুব ভাল করে দেখলেন বাঘটাকে। তারপরেই মহানন্দে বলে উঠলেন—কি বলছ তোমরা? এ তো আমার লালু নয়। শেষপর্যন্ত তাহলে লালুই জিতেছে। সে আমার আততায়ীকে মেরে ফেলেছে।

"স্বামীজীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তাঁর নিশ্বাসে ঝরে পড়ে পরম তৃপ্তি। বার বার বাঘটাকে দেখেন আর বলতে থাকেন—কী, পারলি আমার লালুর সঙ্গে? তার সঙ্গে পেরে ওঠা কি সহজ কথা? কেন তুই মরতে এলি এখানে?

"স্বামীজী আবার ঢলে পড়লেন। জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে

থাকলেন। তাঁর বুকটা ফুলে উঠতে লাগল। ডাক্তার তাঁকে নিষেধ করলেন কথা বলতে। কিন্তু কাকে বলা। জীবনে যিনি কখনও মরণকে ভয় করেন নি, তিনি কি অন্তিম মুহূর্তে নীরব থাকতে পারেন।

"হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন স্বামীজী। আমরা ঝুঁকে পড়লাম তাঁর দিকে। তিনি বললেন—লালু কোথায় গেল? আমার লালু? সে বোধহয় তোমাদের দেখে, আমার কাছে আসছে না। তোমরা চলে যাও এখান থেকে। তাকে আসতে দাও আমার কাছে। আমার যে সময় ফুরিয়ে এল।

"আমরা নির্বাক। স্বামীজী বার বার সেই একই অনুরোধ করতে থাকলেন। কিন্তু ঐ অবস্থায় এই গহন বনে তাঁকে একা ফেলে আমরা চলে যাই কেমন করে?

"অবশেষে শান্ত হলেন স্বামীজী। গতরাতের সমস্ত কথা বললেন আমাদের। বললেন—লালু খুব দূরে যায় নি। কাছাকাছি আছে। তবে সেও বাঁচবে না। দু-একদিন বাদে আসে-পাশে তোমরা তাকে একটু খুঁজে দেখো। ওর সামনের দিকে ডান পায়ে একটা কাটা দাগ আছে। ছোটবেলায় কেউ ওকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে জখম করেছিল। আমিই ওর চিকিৎসা করেছিলাম। সেই দাগটা এখনও রয়ে গেছে। তাকে তোমরা জীবিত ধরতে পারবে না। কিন্তু তার মৃতদেহ পেলে, এনে সমাধি দিও আমার পাশে—ঐ পিপল গাছের নিচে। ও জায়গাটা লালুর বড়ই প্রিয়।

"সন্ধ্যের আগেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন স্বামীজী। লালুর ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া গেল পরদিন দুপুরে বনের ভেতরে, একটা ঝরণার ধারে। পিপল গাছের নিচে একই সঙ্গে পাশাপাশি সমাধি দেওয়া হল দুজনকে—পিতা ও পুত্রকে।

"আপনি দেখে এসেছেন সে সমাধি—সহমরণের সমাধি।"

কী পাই নি

সব পেয়েও কি পাই নি ?

দুজনেই ভাবছেন। ভাবছেন কয়েক বছর ধরেই। ভাবনার কূল-কিনারা না পেয়ে পেশা ছেড়েছেন, নেশা ছেড়েছেন, ঘর ছেড়েছেন, ঘরনী ছেড়েছেন। কিন্তু ভাবনা ছাড়তে পারেন নি।

ভাবতে ভাবতে কলকাতা থেকে হরিদ্বার এসেছেন, হরিদ্বার থেকে ঋষীকেশ এসেছেন, ঋষীকেশ থেকে বাসে চেপেছেন। বাস থেমেছে কিন্তু ভাবনা থামে নি।

কথা ছিল যতদূর বাস চলে, ততদূর যাবেন ওঁরা। বাস এল ঝালা পর্যন্ত। ঝালা উত্তরকাশী জেলার একটি জনপদ, আপেল উদ্যানের জন্য বিখ্যাত। এখান থেকে হরশিল বা হর-প্রয়াগ অথবা ভগৌরি মাত্র সাড়ে তিন মাইল। আর গঙ্গোত্রী মোটে পনেরো মাইল। একটু কষ্ট করলে, এক দিনেই পৌঁছনো যায় হিমালয়ের এই পরম পবিত্র গিরিতীর্থে। কিন্তু কষ্ট করতে প্রস্তুত নন ওঁরা। ওঁরা গঙ্গোত্রী যাবেন না।

মোটর পথ প্রসারিত হচ্ছে। হরশিল ছাড়িয়ে জংলা পর্যন্ত জীপ চলছে। অদূর ভবিষ্যতে বাস যাবে গঙ্গোত্রী। যখন যাবে, তখন দেখা যাবে। এখন তো যাচ্ছে না। তাই আপাতত এখানেই যাত্রা শেষ। লাঠি হাতে ঝোলা কাঁধে, ধুঁকতে ধুঁকতে এই পাহাড়ী পথে এগুতে পারবেন না ওঁরা। তাতে যত পুণ্যই থাক। আর পুণ্যের লোভে তো ওঁরা আসেন নি এখানে। কারণ পাপ বলে যদি সত্যই কিছু থেকে থাকে এ সংসারে, তাহলে ওঁরা দুজনে সারা জীবন ধরে তা এত বেশি করেছেন যে জীবনের বাকি

দিন কটিতে অজস্র পুণ্যার্জন করলেও নরক-যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবেন না।

তাহলে ওঁরা কেন এলেন এখানে? তাই তো ভাবছেন দুজনে।

ওদের ধারণা ছিল, অর্থ সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জন করতে পারলেই সব পাওয়া যায়। সব পেয়েও কি যেন ওরা পান নি। তাই আজ এসেছেন এখানে।

একই উদ্দেশ্য, একই সঙ্গে, একই জায়গায় এসেছেন দুজনে। কিন্তু দুদিন আগেও ওঁরা ছিলেন অপরিচিত। ঋষীকেশে আলাপ হয়েছে ওঁদের। বিলাপের মাধ্যমে দুজনে দুজনের দুঃখকে জেনেছেন। স্থির করেছেন, জীবনের বাকি দিনকটি ওঁরা এমন জায়গায় কাটাবেন, যেখানে যেতে কোন কষ্ট নেই, যেখানে বাঁচতে কোন কষ্ট নেই, অথচ যেখানের সঙ্গে ওদের সমাজের কোন যোগ-সূত্র নেই। তাই ওঁরা আজ এসেছেন এখানে।

বাস থেকে নামলেন দুজনে—সর্বশ্রী ধনগোপাল ও নরনারায়ণ। ওঁরা দুজনে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কেউ কারও পরিচয় জিজ্ঞেস করেন নি। কি হবে অতীতের পরিচয় পেয়ে? কর্মজীবনে ওঁরা যে যাই করে থাকুন, আজ সে জীবন পরিত্যক্ত। আজ ওঁরা একই পথের পথিক। কিন্তু এ পথেরই বা শেষ কোথায়?

দু'বন্ধু নিজেদের মালপত্র বুঝে নিলেন, দুজন কুলির মাথায় চাপিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। কুলিরা জিজ্ঞেস করে, "কিধর জাইয়েগা?"

দুজনে দুজনেব মুখের দিকে তাকান। তাইতো কোথায় যাবেন ওঁরা? এত কথা ভেবেছেন, কিন্তু এ কথাটি তো ভাবা হয় নি।

প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে বিস্মিত কুলিরা দাঁড়িয়ে পড়ে। নর-নারায়ণ বিচলিত হন; কিছুই যে জানে না এখানকার।

কিন্তু ধনগোপাল ঘাবড়াবার পাত্র নন। সামান্য থেকে অসামান্য হয়েছিলেন তিনি। তাঁর এক মুহূর্তের সিদ্ধান্তের ওপরে লক্ষ লক্ষ টাকার লাভ-লোকসান নির্ভর করেছে। কাজেই তিনি সবজান্তা ভাব দেখিয়ে কুলিকে বলেন, "ডাকবাংলোমে চলো।"

"রিজার্ভ হ্যায়।"

"তুম চলো। হ্যায় কি নহী হ্যায়, হাম দেখেঙ্গে।" মুখে যতই হাঁকডাক ছাড়ুন, মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন, তাহলে এখানে একটা ডাকবাংলো আছে।

ডাকবাংলোর চৌকিদার কিন্তু ঘর দিতে রাজী হল না। বেগর-পারমিট ঘর দিলে তার নাকি নোকরী যাবে। কিন্তু নোকরী রাখার কায়দা-কানুন জানা আছে ধনগোপালের। তিনি দু'টাকার একখানি নোট গুঁজে দিলেন চৌকিদারের হাতে। তারও নোকরী রইল, ওরাও ঘর পেলেন।

খাটিয়ার ওপরে আরামে গা এলিয়ে দিয়ে নরনারায়ণ ভাবলেন—ভাগ্যিস উৎকোচ-মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে দেবতাত্মা হিমালয়ে। বাস্তবিকই এমন মোক্ষম বস্তু যে আর নেই এ সংসারে, এ কথা তাঁর চেয়ে কে বেশি জানে। তিনি জীবনে যে আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছেন, তার মূলে এই মোক্ষম বস্তু। এই বস্তু দিয়েই বরানগরে বাড়ি, গাড়ি আর সেই সঙ্গে আনুসঙ্গিক। যা চেয়েছেন তাই পেয়েছেন। তবু কেন বার বার মনে হয়, সব পেয়েও কি যেন পান নি। আর তাই তিনি আজ এখানে।

চৌকিদার চা নিয়ে আসে। নরনারায়ণ উঠে বসে পেয়ালাটা হাতে নেন। চৌকিদার চলে যায়। চায়ে চুমুক দিয়ে ধনগোপাল বলেন, "দেখলেন এখানেও ঘুষ ছাড়া ঘর পাওয়া যায় না।"

"দেখলাম। তাই ভাবছি এখানে নয়, অন্য কোনখানে। যেখানে মানুষ নেই, যেখানে ঘুষ নেই।"

"আরে, আমারও তো তাই মনে হয়েছে। চৌকিদারকে বলেছি। সে বলেছে শ্যামপ্রয়াগ।..."

"না, না। প্রয়াগ-ট্রয়াগ নয়। প্রয়াগ হলেই পাণ্ডা থাকবে, দক্ষিণা থাকবে।"

"আরে শুনেই নিন না কথাটা। প্রয়াগ নয়, শ্যামগঙ্গা আর ভাগীরথীর সঙ্গম ছাড়িয়ে আরও কিছুটা ওপরে উঠে গেলে একটা ঝরণার ধারে খানিকটা সমতল জায়গা আছে। সেটুকু কিনে সেখানেই বাসা বাঁধবো আমরা।"

প্রস্তাবটা নরনারায়ণের মনঃপূত হয়। তিনি মহা উৎসাহে বলে ওঠেন, "আমাকে টাকা-পয়সা কি দিতে হবে, বলবেন কিন্তু। দুজনে সমান সমান অংশীদার হব। একজনের শেয়ার বেশি হলেই গোলমাল।"

"হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। এখানে যেন শেয়ার নিয়ে কোন গোলমাল না হয়।"

মাস খানেকের মধ্যেই ওঁদের বাসা বাধা শেষ হল। দিনক্ষণ দেখে পুজো-পার্বণ করে ওরা 'শান্তি কুটির'য়ের বাসিন্দা হলেন। জায়গাটি যেমন মনোরম তেমন নির্জন। কুটিরটিও হালফ্যাশানের কেতাদুরস্ত—মডার্ন কটেজ। কাঠের তৈরি—দুপাশে দুখানি শোবার ঘর, মাঝখানে বৈঠকখানা, সামনে বারান্দা, পেছনে কিচেন। বারান্দার সামনে একফালি জমি—বাগান করা হবে। ফল নয়, ফুল। ফল তো ওঁরা সারা জীবন ধরেই কুড়িয়েছেন, কিন্তু ফুল তুলতে পারেন নি কখনও। ফলের জন্য ফুল হারিয়েছেন।

পাশে নির্মলা নির্ঝরিণী, নিচে বেগবতী ভাগীরথী। ওপারে পাহাড়, এপারও সমতল নয়, ছোট বড় টিলায় বোঝাই। তারই

ফাঁকে ফাঁকে, পাহাড়ের বুকে বুকে ধাপে ধাপে ক্ষেত—রামদানা, ভুট্টা, সরষে ও আলু, মাঝে মাঝে আপেল বাগান। কুটিরের পাশ দিয়ে পায়ে চলা পথ গিয়ে মিশেছে বড় রাস্তায়—হরশিলের রাস্তায়। পায়ে চলা পথ দিয়ে দিনে দূর গাঁয়ের মানুষরা আসা-যাওয়া করে। আর রাতে? না নরনারায়ণ দেখেন নি কখনও। তবে ধনগোপাল নাকি সেদিন রাতে বাইরে বেরিয়ে ছটো ভালুককে দেখতে পেয়েছিলেন। দেখে অবশ্য আর দাঁড়ান নি, এক দৌড়ে ঘরে এসে, দোর বন্ধ করে চিৎকার শুরু করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে রাতে বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিয়েছেন ওঁরা। সারা জীবন যাদের বাইরে কেটেছে, আজ তারা ঘরকুনো। বহির্জগতের সঙ্গে আজ আর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু কেন ওঁদের এই নির্বাসন?

নির্বাসিত জীবন কিন্তু বৈচিত্র্যময়। শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে লণ্ঠন জ্বালিয়ে একজন গীতা পাঠ করেন, আরেকজন চুপ করে শোনেন। তারপর ভোরের আলো ফুটলে ছজনে বেড়াতে বের হন। ফিরে এসে আহ্নিক সেরে উনোন ধরিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দেন। ইতিমধ্যে হরি সিং এসে যায়। বারান্দায় বসে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ওঁরা হিমালয়ের সূর্যোদয় দেখেন। তারপরে থলি হাতে ছজনে বাজারে যান—প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছু কিনে কুটিরে ফিরে জলযোগ সারেন। শুরু হয় কৃষিকার্য। ফুল ফোটাবার প্রচেষ্টা চলে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। ইতিমধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন সম্পূর্ণ করে হরি সিং হাঁকডাক শুরু করে। ওরা গামছা কাঁধে ঝরণায় যান। ভূরি-ভোজের শেষে ট্রানজিস্টার শুনতে শুনতে ছজনে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘণ্টা ছয়েক একটানা দিবানিদ্রার পরে দাবার আসর বসে। চলে হরি সিং এসে চা পরিবেশন করা পর্যন্ত।

চা খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে দুজনে আসেন শ্যামগঙ্গা ও গঙ্গার সঙ্গমে। দুই খরস্রোতা স্রোতস্বিনীর মিলন ক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে ওরা চুপচাপ বসে থাকেন আর ভাবেন। ভাবতে ভাবতে কখন যে সঙ্গমের বুকে দিনের শেষ শিখাটি যায় মিলিয়ে, খেয়াল থাকে না। খেয়াল যখন হয় তখন বিশ্বের আলো নিঃশেষ হয়েছে। আঁধার নেমে এসেছে চারিদিকে—গাড়োয়ালের গহন-গিরি-কন্দরে।

টর্চের আলোয় সেই অসীম আঁধার সরিয়ে ওঁরা কুটিরে ফেরেন। রুটি, সবজি ও দুধ দিয়ে রাতের খাওয়া সেরে ওঁরা খাটিয়ায় শুয়ে পড়েন। কিন্তু ঘুমোতে পারেন না। সারা জীবন অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন ওঁরা! বিনা পরিশ্রমে কত ঘুমনো যায়। তাই কোনদিন বা বাতি জ্বালিয়ে বই নিয়ে বসেন, কোনদিন বা বাতি নিবিয়ে বৈঠকখানায় বসে নিজেদের ফেলে আসা জীবনের কথা ও কাহিনী বলতে থাকেন।

ধনগোপাল বলেন, "বুঝলে নারু, আমার সারাটা জীবনই কেটেছে লড়াই করে। প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই। জন্মেছিলাম দরিদ্রের ঘরে। বাবা ছিলেন টোল পণ্ডিত। জমিজমা কিছুই ছিল না। যা আয় করতেন তাতে মাসের শেষে দুবেলা খাওয়া জুটতো না। তবু যাহোক খেয়ে না খেয়ে কোন রকমে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো এই সময় হঠাৎ বাবা পড়লেন অসুখে—কঠিন অসুখ। বাধ্য হয়ে স্কুল ছেড়ে আমাকে চলে আসতে হল কলকাতায়। অনেক ঘোরাঘুরি করে বড় বাজারে এক মহাজনের গদিতে খাতা লেখার কাজ পেলাম। সেই থেকে আমার কর্ম-জীবন শুরু। কয়েক বছর বাদে কাজ ছেড়ে দালালী আরম্ভ করলাম। দালাল থেকে ডীলার, ডীলার থেকে ডিরেক্টার—আমার স্বপ্ন সত্য হল।"

"তাহলে প্রোলেটারিয়্যাট থেকে ক্যাপিট্যালিস্ট হতে তোমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। কি বল ?"

"তা তো হয়েছেই। কিন্তু ক্যাপিট্যালিস্ট হওয়া আর ক্যাপিট্যালকে রক্ষা করা এক জিনিস নয় রে ভাই। কারখানা বসানোর চেয়ে কারখানাকে বাঁচিয়ে রাখা আরও কঠিন। এই ধর আমার কারখানায় সেই প্রথম ধর্মঘটের কথা। আমি নিজে নিঃস্ব ছিলাম। তাই আমার শ্রমিকদের দুঃখ বোঝার চেষ্টা করতাম। ওদের ইউনিয়নের দাবি-দাওয়া যথাসাধ্য মেনে নিতাম। ভাবতাম এই পথে শিল্পে শান্তি আসবে। কিন্তু ওরা আমার এই উদারতাকে দুর্বলতা বলে ভুল করল। নিত্য-নতুন জুলুম শুরু করে দিল—আজ ক্যান্টিনের রান্না ঠিক হয় নি, কাল ম্যানেজার কাজ না করার জন্য কাকে ধমক দিয়েছেন, পরশু প্রোডাকশান বোনাস বাড়াতে হবে। তাই ইউনিয়নের সম্পাদক রতন রায়কে…"

"কাকে ? রতন রায় ? নরনারায়ণ যেন চমকে ওঠেন।

"হ্যাঁ। রতন রায়। কেন তুমি তাকে চিনতে নাকি ?"

"ইয়ে, মানে…" নরনারায়ণ থতমত খান।

ধনগোপালকে বলার নেশায় পেয়ে বসেছে। তিনি নর-নারায়ণের অস্ফুট উত্তরকে অগ্রাহ্য করে আবার শুরু করেন, "রতনকে ডেকে অনেক বোঝালাম। কিন্তু কাকে বলা ? আর সে ছিল উপলক্ষ মাত্র। আসলে ইউনিয়নের সভাপতিটাই ছিল সর্বেসর্বা—যত নষ্টের গোড়া। ফলে তিক্ততা আরও বাড়ল। পরদিন সামান্য কারণে ওরা ম্যানেজারকে মারপিট করল। নেতৃস্থানীয় কয়েকজন শ্রমিককে বরখাস্ত করলাম। আগুন জ্বলল—শুরু হল ধর্মঘট। পুলিসের সাহায্য নিলাম। ইউনিয়ন অফিস সীল করে দিয়ে সম্পাদক ও সভাপতিকে গ্রেপ্তার করা

হল। কিন্তু ধর্মঘট থামল না। বরং আসে-পাশের কারখানার শ্রমিকরাও আমার শ্রমিকদের সমর্থনে প্রতীক ধর্মঘট করল। ওরা উপবাস মেনে নিল কিন্তু আমাকে মানল না।

"ম্যানেজার পরামর্শ দিল বিষে বিষক্ষয় করার। শ্রমিক ঐক্যে ফাটল না ধরাতে পারলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। যে ভাবেই হোক ইউনিয়নের সম্পাদক ও সভাপতির মধ্যে একজনকে আমাদের হাত করতে হবে। সভাপতি লোকটা শুনেছি বড়ই বেয়াড়া। কাজেই শেষ পর্যন্ত একদিন জেল-হাজতে এসে রতনের সঙ্গেই দেখা করলাম। গোড়ায় তার সে কি তেজ! দেখাই করবে না। শেষে কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বহু টাকা ও প্রোমোশনের লোভ দেখিয়ে ওকে দলে ভেড়ালাম। ব্যাস্ ধর্মঘট মিটে গেল।" থামলেন ধনগোপাল। নরনারায়ণ কিন্তু নির্বাক। ওকে থামতে শুনেও চুপ করে আছেন। ধনগোপাল হেসে বলেন, "কিহে, চুপসে গেলে কেন? এবার তোমার কথা বল।"

আবার যেন তেমনি চমকে ওঠেন নরনারায়ণ। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নেন তিনি। গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, "সেই সভাপতির কি হল?"

"কি আর হবে?" কি যেন একটু ভেবে নেন ধনগোপাল, "রতন সাক্ষী দিল আমার পক্ষে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার অভিযোগে সভাপতির দু'বছর জেল হয়ে গেল।"

"তারপরে?"

"তারপরে আর কি? আবার কারখানা চালু হল।"

"সে তো সেই দু'বছরের কথা, যে দু'বছর সভাপতি জেলে ছিল। তারপর কি হল?"

"দু'বছর বাদে সেই সভাপতি জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরে

যে আমার কারখানায় আবার ধর্মঘট হয়েছিল, তা তুমি জানলে কেমন করে ?"

"কারণ আমিই তোমার কারখানার ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সেই সভাপতি। ভাল করে চেয়ে দেখতো, চিনতে পার কিনা ?"

"হ্যাঁ চেহারা অনেকটা...তবে তার নাম তো ছিল নারায়ণ রক্ষিত।"

"তোমার মত আমিও নামের আগে দুটি অক্ষর যোগ করে দিয়েছি। তুমি যেমন গোপালকে ধনগোপাল করেছ, আমিও তেমনি নারায়ণকে নরনারায়ণ করেছি।"

"ও। আমার নামটা তাহলে তোমার মনে আছে। তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছিলে ?"

"না। সে কতদিন আগের কথা। বোধ হয় বিশ বছর হয়ে গেল।"

"তা হবে। তবে সে দেখা আর এ দেখা। তখন তো আমাদের অহি নকুল সম্পর্ক। আর এখন...?"

"রাম লক্ষণ। বয়সে তুমি কিছু বড়ই হবে।"

"কাল থেকে দাদা বলে ডেকো হে।" ধনগোপাল অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। "তবে সেদিনও কিন্তু স্বার্থের জন্য আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল।"

"হ্যাঁ। করতে বাধ্য হয়েছিলাম। তুমি মালিক, আমি শ্রমিক নেতা। শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে তুমি উপেক্ষা করলে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করলে আমাকে। অথচ আমি সেদিন কলকাতাতেই ছিলাম না। আর আমি থাকলে কোন হাঙ্গামাই হত না। তখনও আমার বিশ্বাস ছিল, সত্যেরই চিরকাল জয় হয়। তাই হাসিমুখেই আমি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু আমার সে বিশ্বাস ধুলোয়

মিশিয়ে দিলে তুমি। রতন সমেত আরও কয়েকজন দাঙ্গাকারী সাক্ষ্য দিল, আমিই নাকি মানেজারকে মেরেছি। আমি বিস্ময় ও হতাশায় ভেঙে পড়লাম। যাদের জন্য আমি জীবনের সর্বসুখ বিসর্জন দিয়েছিলাম, তারাই আমাকে জেলে পাঠালো। প্রতিজ্ঞা করলাম, এই বেইমানীর বদলা নেবো— যেমন করে হোক।"

"কিন্তু তখনও রতনের প্রকৃত পরিচয় পেতে বাকি ছিল। সে পরিচয় যখন পেলাম তখন আমার মাথায় খুনের নেশা চেপে গিয়েছিল। আর খুন আমি করেছিলাম। সেদিন তুমিই হয়েছিলে আমার প্রধান সহায়।" নরনারায়ণ থামলেন।

"হ্যাঁ। দু'বছর বাদে জেল থেকে বেরিয়ে তুমি আবার গোলমাল শুরু করে দিলে। সেবারে তুমি আটঘাট বেঁধে এমন ভাবে সংগ্রামে নেমেছিলে যে আমি বহু চেষ্টা করেও তোমার দলে ভাঙন ধরাতে পারলাম না। রতনের তখন শ্রমিকদের ওপর কোন প্রভাব নেই। তাকে শ্রমিকরা সবাই একবাক্যে দালাল বলে। তাছাড়া রতন তখন বিয়ে করে ঘোর সংসারী—সে আমাকে কোন সাহায্যই করতে পারল না। মাসের পর মাস ধরে ধর্মঘট চলল। আমার কারখানা প্রায় উঠে যাবার সামিল হল। বাধ্য হয়ে মিটমাটের জন্য তোমাকে আমি ডেকে পাঠালাম। তুমি এলে; আমি তোমার আগের দাবিগুলো মোটামুটি মেনে নিলাম। কিন্তু তুমি সুযোগ পেয়ে দাবির বহর বাড়িয়ে ফেললে। শ্রমিকরা তোমার সঙ্গে সায় দিল। বুঝলাম যেন-তেন-প্রকারেণ তোমাকে হাত করতে হবে। তাই কৌশলে ঠিকানাটি জেনে নিয়ে সেদিনের মত আলোচনা মুলতুবী রাখলাম।

"পরদিন সন্ধ্যের পরে আমি গেলাম তোমার বাড়িতে—বস্তি বললেও তুমি বোধকরি আপত্তি করবে না···"

"না।"

"আমি সোজাসুজি প্রস্তাবটা করলাম তোমাকে—কত টাকা পেলে আপনি আর দাবি না বাড়িয়ে ধর্মঘট তুলে নিতে পারেন ?

—সবাই রতন রায় নয়।

—তা জানি।

—তাহলে এসময়ে এ প্রস্তাব নিয়ে এখানে এসেছেন কেন ?

—কারণ আপনার টাকার দরকার। আমি চাইনে আপনার মত একজন নেতা এরকম বস্তিতে বাস করে। আমি চাইনে সম্ভাবনাপূর্ণ এমন একটি প্রতিভার অপমৃত্যু হয়।

—মানে ?

—জীবনে আপনাকে বড় হতে হবে—বড় নেতা হতে হবে। একটা কারখানা নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। সারা দেশের শ্রমিক আন্দোলনের পুরোভাগে স্থান করে নিতে হবে। সেজন্যে চাই প্রচার, চাই প্রতিষ্ঠা—যা অর্থ ছাড়া হতে পারে না। আমি আপনাকে সাহায্য করব। এই নিন তার প্রথম কিস্তি।

তুমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলে। কিন্তু চেকে লেখা টাকার অঙ্কটা দেখে তা পারলে না। কারণ তখন পর্যন্ত তুমি একসঙ্গে অত টাকা দেখনি। তবে তুমি বললে, চেক নয় ক্যাশ। আর বললে···বল না হে সেদিন কি বলেছিলে।" ধনগোপাল বন্ধুকে অনুরোধ করেন।

একটু ভেবে নিয়ে নরনারায়ণ বলেন, "সেদিন আমরা ছিলাম শত্রু। কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটা সাময়িক সন্ধি করে ছিলাম। সন্ধির প্রথম সর্ত ছিল টাকা, দ্বিতীয় সর্ত ছিল রতন। আমি বলেছিলাম—রতনকে সরিয়ে ফেলতে হবে এ দুনিয়া থেকে।

—মানে ?

—তাকে মেরে ফেলতে হবে।

—ছেলেটা মাত্র বছরখানেক হল বিয়ে করেছে। বৌটি বড় ভাল। শিক্ষিতা সুন্দরী বুদ্ধিমতী। কি যেন নাম...?

—ভক্তি।

—হ্যাঁ। ভারী লক্ষ্মী মেয়েটি। না, না। একি বলছেন আপনি। অমন মেয়েকে বিধবা করব? অন্তত তার কথা ভেবেও...

—যদি বলি তার কথা ভেবেই আমি এ প্রস্তাব করছি।

—মানে?

—মানে ভক্তি আমার শৈশবের সাথী, কৈশোরের কল্পনা, যৌবনের সুপ্রিয়া। আমিই রতনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। রতন শুধু আমার রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। সে আমার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গেও বেইমানি করেছে। আমার কারাবাস ও ভক্তির বাবার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সে জোর করে তাকে বিয়ে করেছে। রতনের মৃত্যু হলে ভক্তি মুক্তি পাবে।" নরনারায়ণ থামলেন। তাঁর চোখদুটি সজল হয়ে উঠেছে। চোখ মুছে চুপ করে থাকেন তিনি। হয়তো বা ভাবতে থাকেন সেই ভুলের কথা।

ধনগোপালও চুপ করে আছেন। হয়তো বা তিনিও ভেবে চলেছেন—জীবনে বড় হবার জন্য সেদিন কত ছোট কাজ করতে হয়েছিল তাঁকে। রতনের জীবনের বিনিময়ে তিনি তাঁর জীবনে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু সেদিনের সে শান্তিকে আজ অশান্তি বলে মনে হচ্ছে কেন?

আর নরনারায়ণ? সে তো ভক্তিকে পেল। জীবনে অনেক বড় হল। তাহলে সে আজ এখানে কেন? ভক্তি আজ কোথায়?

সেই কথাই ধনগোপাল নরনারায়ণকে জিজ্ঞেস করলেন।

নরনারায়ণ বললেন, "তাকে আমি নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু রাখতে পারলাম না! সে চলে গেল।"

"কোথায়?"

"রতনের কাছে। আমার ভুল হয়েছিল। ভেবেছিলাম সে আমাকে ভালবাসে। কিন্তু সে ভালবাসত রতনকে। তাই সে সতীত্ব রক্ষার জন্য আত্মহত্যা করল। নিজের জীবন দিয়ে ভক্তি আমার ভুলের মাশুল দিয়ে গেল।"

ধনগোপাল নির্বাক। কিছুক্ষণ বাদে নরনারায়ণই আবার বলেন, "তোমার মত শিল্পপতিদের দৌলতে জীবনের কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে নি। যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। তখন সেই পাওয়াকেই পরম পাওয়া বলে মনে হয়েছে। একবারও মনে হয় নি—কী পাই নি?" থামলেন নরনারায়ণ। কি যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপরে হঠাৎ ধনগোপালকে প্রশ্ন করে বসলেন, "কিন্তু তুমি এখানে কেন? তোমার কারখানা তো আরও বড় হয়েছে। ছেলেদের বিদেশ থেকে ঘুরিয়ে এনেছ, মেয়েদের ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছ। তুমি তো সবই পেয়েছ।"

"এই পাওয়াটা কেবল আমার জীবনের একদিক—যেদিকটা সবাই দেখেছে। আরেকটা দিক দেখেছে কেবল একজন—সে আমার মন। সেই মনের মুকুরে নিজেকে দেখার জন্যেই আমার এই নির্বাসন। হয়তো বা তোমারও। জীবন-যুদ্ধের দুই বিরুদ্ধ শিবিরের সৈনিক আমরা, সংগ্রামের শেষে একই উদ্দেশ্যে মিলেছি এখানে—এই দেবতাত্মা হিমালয়ে।"

বৈশাখী পূর্ণিমা

ঠিক জেলখানার সামনে বাস থেকে নামলাম। জেলে যাবার জন্য নয়। এখন আর আগের মত জেলে যেতে চাই না। যদিও বিশ্বাস করি, 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে'। শক্ত বাঁধনের বিষে যে এখনও আমার জীবন-যৌবন জর্জরিত। তাই হলেও জেলখানার সামনে একবার থমকে দাঁড়াই। যতদূর দেখা যায়, ভেতরটা দেখে নিই। আমার বহুকাল কেটেছে এমনি এক জেলখানার অন্দর-মহলে। মনে পড়ে সে-সব দিনের কথা। মনে পড়ে সঞ্জয়দার কথা। জেলে বসেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব। অথবা তার চেয়েও কিছু বেশি। তাইতো আজ এ সময়ে এখানে। সঞ্জয়দার ছেলে শান্তনুর আজ বউ-ভাত। ওদের বাড়িটা ঠিক জেলখানার পেছনে।

শান্তনু এখন ইঞ্জিনীয়ার—বড় চাকুরে। সঞ্জয়দার মেয়ে দুটিও খুবই ভাল হয়েছে। বড় মেয়ে সান্ত্বনা বি. এ. পাস করে একটা সরকারী অফিসে চাকরি নিয়েছে। ছোট মেয়ে শান্তি এ বছর ডিগ্রী পরীক্ষা দেবে।

বা! ভারি সুন্দর সাজিয়েছে তো। চমৎকার করেছে তোরণটা! অবিকল একটি শ্বেতহস্তী শুড় দিয়ে অভ্যাগতদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। তার পিঠে নহবত্‌খানা—লাল শালু আর মখমল দিয়ে তৈরি। যেন হাওদায় বসে হাতিতে চড়ে বাজনদারের দল চলেছে কোন এক দূর দেশে। পূরবীর মিঠে সুর মত্ত পবনকে উন্মনা করে তুলেছে।

উন্মনা করছে আমাকেও। সঞ্জয়দা কি কোনদিন ভেবেছিলেন, এত আড়ম্বরের মধ্যে তার ছেলের বউভাত হবে? বাবা মারা গিয়েছিলেন খুব ছোটবেলায়। বিধবা মা দেশের জমি-জমার সামান্য আয় দিয়ে বহু কষ্ট করে ছেলেকে বি. এ. পাস করিয়েছিলেন। পোস্ট অফিসের একটা ভাল চাকরি পেয়েছিলেন সঞ্জয়দা। অনেক কাল পরে সুখের মুখ দেখেছিলেন মা। কিন্তু ছোট-সুখ মানুষকে বড়-সুখের প্রতি প্রলুব্ধ করে। যা পায়, তাতে মন ভরে না মানুষের। সঞ্জয়দার বিয়ে দেবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন মা। সঞ্জয়দার সকল প্রতিবাদকে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'বাপের একটি মাত্র মেয়ে, তাই বলে বাপ আদর দিয়ে মাথা খায় নি মেয়ের। যেমন রূপ তেমনি গুণ। লক্ষ্মীর মতই স্বভাব আমার মালক্ষ্মীর।' তারপরে কণ্ঠস্বরকে খাদে নামিয়ে করুণ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমার বড় আশা বাবা, তোর বউ দেখে মরব। মরার আগে একটু সুখের মুখ দেখব।'

মাকে সুখী করতে মাথায় টোপর পরতে হয়েছিল সঞ্জয়দাকে, সাত-পাক ঘুরতে হয়েছিল সেই লক্ষ্মী মেয়েটির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে। ছেলে-বউ নিয়ে দশ বছর সুখেই ঘর করেছিলেন মা। তিনটি নাতি-নাতনীর মুখ দেখেছিলেন ঠাকুরমা। তারাই হয়ে উঠেছিল তাঁর নয়নের মণি। তাদের নিয়ে ছেলে-বউয়ের সঙ্গে বহু মন কষাকষি হয়েছে তাঁর। তিনি তখন কেবল ছয়ের ঘরে পা দিয়েছেন। স্বাস্থ্য ভালই ছিল, আরও কিছুদিন নিশ্চয়ই বাঁচতেন। সঞ্জয়দার চাকরিরও ইতিমধ্যে অনেক উন্নতি হয়েছিল। বেশ ভাল মাইনেই সঞ্জয়দা তখন পেতেন। বড়ই সুখে তাঁর দিনগুলো অতিবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু ক-জনের কপালের সুখ সয় এ সংসারে। মাতৃভক্ত সঞ্জয়দা তাঁর মায়ের সকল সুখ হরণ করলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর কারণ হলেন।

এলো উনিশ শো বিয়াল্লিশ—'এলো মহাজনমের লগ্ন'। চল্লিশ কোটি মানুষের নবজন্ম হল। আসমুদ্র হিমাচলের আকাশ বাতাস পরিব্যপ্ত হল এক অশ্রুতপূর্ব মহাধ্বনিতে—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।' মানুষের চেয়ে বড় হল মাটি, মায়ের চেয়ে দেশ—নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, ছোট বড় সবার কাছে।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সঞ্জয়দা। পেছনে পড়ে রইল—বৃদ্ধা মা, যুবতী স্ত্রী আর অসহায় তিনটি ছেলে-মেয়ে। বৃটিশ সরকারের অফিসার হয়ে ত্রি-বর্ণ রঞ্জিত পতাকা হাতে বৃটিশ ফৌজের উদ্ধত বেয়নেটের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বন্দনা করলেন, 'বন্দে মাতরম্।'

অমার্জনীয় অপরাধ। পরাধীন দেশের মানুষ তার জননী জন্মভূমিকে বন্দনা করে কোন্ সাহসে! হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে পথের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হল হাজতে। লাল সুরকির পথ আরও লাল হল। পরদিন হাতকড়া লাগিয়ে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল আদালতে। ন্যায়বিচারের নামে চলল বিচারের প্রহসন। আসামীর কাঠগড়ায় দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকতে হল। বৌদি শাশুড়ী ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে রোজ উপস্থিত হতেন আদালতে। সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সঞ্জয়দার দিকে ব্যাকুল নয়নে তাকিয়ে থাকতেন। আর সঞ্জয়দা—সঞ্জয়দাও চেয়ে দেখতেন তাঁদের। কিন্তু তাঁর চোখে ছিল না কোন আকুলতা। পরম তৃপ্তির মৃদু একটু হাসি সব সময়েই লেগে থাকত তাঁর মুখে।

নানা টাল-বাহানার পরে অবশেষে পুলিস কর্তৃপক্ষ তাদের রিপোর্ট পেশ করল। সে রিপোর্ট শুনে বিস্মিত হলেন সঞ্জয়দা। কর্তৃপক্ষ আবিষ্কার করেছে—সঞ্জয়দা আশৈশব অন্তর্ঘাতী কার্য-কলাপে লিপ্ত। কিছুদিন আগে রহমতপুর পোস্ট-অফিস লুটের

নেতৃত্ব করেছেন। আই. বি. ইনফর্মার ললিত নাগকে ঠেঙাবার মূলেও নাকি তিনি।

গয়না বেচে মামলার খরচ যোগাড় করে ছিলেন বৌদি। কিন্তু গল্পই সত্য হল। পুলিস রিপোর্ট অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হল। বিচারে আট বছরের জেল হল সঞ্জয়দার। ম্যাজিস্ট্রেটের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শুনে মা আদালতের মধ্যেই ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। কিন্তু বৌদি ছিলেন নির্বাক নিস্পন্দ নিথর। সঞ্জয়দার চোখের কোল বেয়ে কয়েক ফোঁটা অবাধ্য অশ্রু নেমে এসেছিল। কিন্তু পরমুহূর্তে দু হাতে সেই জল মুছে ফেলে তিনি মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। হাসি মুখেই পুলিস ভ্যানে গিয়ে উঠেছিলেন। বৌদি তবু কাঁদেন নি। শান্তনু আর সান্ত্বনাও মার হাত ধরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। শান্তি কেবল চীৎকার করে উঠেছিল, 'ঠাকুমা, ওরা বাবাকে নিয়ে গেল। আমি বাবার কাছে যাব।'

বোকা মেয়ে। জানে না যে বাবা যেখানে গেলেন, সেখানে যেতে হলে মিথ্যে মামলার আসামী হতে হয়।

জেলে বসেই সঞ্জয়দার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আমি গিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে। আমি দাগী আসামী। আন্দোলন নিরস্ত হবার অনতিকাল পরেই আমাকে রাজরোষে পড়তে হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল, আমাদের আটকে রাখতে পারলেই তাদের শোষণের পথ নিষ্কণ্টক হবে। কিন্তু তখনও তারা ধারণা করতে পারে নি যে যাঁদের বলে বলীয়ান হয়ে রাজত্বের রথ চালিয়ে যাচ্ছে, তাঁরাই একদিন ওদের চরম আঘাত হানবে। সুদূর সিঙ্গাপুর থেকে সে অভিযান হবে শুরু। অভিযাত্রীরা নদী-নালা, বন-জঙ্গল আর পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে 'কদম্ কদম্ বাড়ায়ে' দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হবেন। ইম্ফলের মুক্তিক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাঁদের মোকাবিলা হবে। তাঁদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আসমুদ্র হিমাচল

মথিত হবে এক মহাধ্বনিতে—'দিল্লী চলো।' আর আরব সাগরের বুকে কামান গর্জে উঠে দু-শ বছরের বৃটিশ শাসনের অবসান ঘোষণা করবে।

সে এক অন্য ইতিহাস। সে ইতিহাসের কথা আজ থাক। আজ শুধু সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করি সেই মুক্তিযজ্ঞের পুরোহিত ভারত ভাগ্যবিধাতা নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে।

"এতক্ষণে আপনার সময় হল?" শান্তির স্বরে স্পষ্ট অভিযোগ। আমি তোরণের সামনে পৌঁছে গেছি। দুটি বান্ধবীর সঙ্গে অভ্যাগতদের অভ্যর্থনায় শান্তি ব্যস্ত। হাতে বেলফুলের মালা। অভ্যাগতদের মাল্যদান করছে ওরা।

অভিযোগ মেনে নিয়ে শান্তিকে বলি, "একটু কাজে আটকে পড়েছিলাম মা, তাই দেরি হয়ে গেল।"

"যা হবার হয়েছে, এবারে শিগ্‌গীর ওপরে চলে যান। মা অনেকবার আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছে।" শান্তি আমাকে তাগিদ দেয়। আমি এগিয়ে চলি।

"বারে আপনি মালা নিলেন না যে বড়?"

আবার থামতে হল। পেছন ফিরে দেখি শান্তির একটি সঙ্গি মালা হাতে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বেলফুলের মালা—দেখতে সুন্দর, গন্ধ সুন্দর। আজ এই শুভক্ষণে সবাইকে নিতে হবে হাতে। কিন্তু আমার সঙ্গে যে সুন্দরের সকল সম্পর্ক গেছে ঘুচে তা ওরা জানবে কেমন করে। একবার ভাবি মেয়েটিকে বলি—জীবনে যার কোনদিন মালার প্রয়োজন হল না, এ মালা আজ তোমরা রেখে দাও তার মৃত্যুদিনের জন্য।

কিন্তু মালাটা যে বেলফুলের। সঞ্জয়দা বেলফুল বড়ই ভালবাসতেন। জেলখানার বাগানে বেলফুল ফুটতো। কয়েদীদের

পয়সা দিতেন তিনি। তারা তাঁকে বেলফুল দিয়ে যেত। আজ সঞ্জয়দার ছেলের বউভাত। বেলফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে অভ্যাগতদের। সঞ্জয়দা নেই কিন্তু বেলফুল আজও ঠিক তেমনি ফুটছে।

মালাটি হাতে নিয়ে মেয়েটিকে বলি, "আমি যে এ বাড়ির লোক, আমাকেও মালা নিতে হবে?"

"হ্যাঁ, সব্বাইকে। এই দেখুন না, আমরাও খোঁপায় বেঁধেছি।"

"ও, তাওতো বটে। কিন্তু আমার যে খোঁপা নেই?

প্রথমে একটু হেসে ফেলে মেয়েটি। তারপরে সহসা গম্ভীর হয়ে আমাকে ধমক দেয়, "আপনি দেখছি কিছ্ছু জানেন না কাকাবাবু। আপনি হাতে বেঁধে রাখবেন। এই…এ রকম করে, ঠিক রাখীর মত—"

প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমাতে আমাদের সবাইকে রাখী বেঁধে দিতেন সঞ্জয়দা।

…একি? আজও যে আকাশে দেখছি পূর্ণচন্দ্র। এটাও তো বৈশাখ মাস। একেবারেই খেয়াল ছিল না। স্বাধীন ভারতের নাগরিক আমরা—আমরা ভুলে গেছি সঞ্জয়দাদের কথা, ভুলে গেছি রাখীবন্ধন আর বৈশাখী পূর্ণিমাকে। ভুলে গেছি জালিয়ানওয়ালা বাগের কথা।

"কাকাবাবু, এসে গেছেন। ওপরে চলুন।" শান্তনু ছুটে এসে প্রণাম করে আমাকে। ওকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। সঞ্জয়দার স্বাস্থ্য আর বৌদির সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্ট শান্তনু। বর পোষাকে চমৎকার মানিয়েছে ওকে। শান্তনুর একখানি হাত হাতে নিয়ে হেঁটে চলি কাঁকর বিছানো পথ দিয়ে। পথের দু'পাশে বাগান…শ্যামল কোমল তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ডে রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, জুঁই, জবা, শেফালিকা আর মরশুমী ফুলের সমারোহ।

শান্তনুর সঙ্গে দোতলায় উঠে আসি। সিঁড়ির গোড়াতেই সান্ত্বনার সঙ্গে দেখা। আনন্দের আতিশায্যে সান্ত্বনা চীৎকার করে ওঠে, "কাকাবাবু তা হলে সত্যই এসেছেন।"

"হ্যাঁ মা, সত্যই এসেছি।"

"চলুন, বৌদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।"

শান্তনু প্রতিবাদ করে ওঠে,—"না, না। আগে মার সঙ্গে দেখা করে নিন, তারপরে নিয়ে যাবি'খন। মা অনেকবার কাকাবাবুর খোঁজ করেছে।"

"মার কাছে তো যাবেনই। যেজন্য আজ উনি এসেছেন এ বাড়িতে, আগে সেই কাজটা সেরে নিন। কি বলেন কাকাবাবু?"

একটু থেমে সান্ত্বনা দাদাকে বলে, "তুমি বরং মাকে গিয়ে খবর দাও, আমি বৌদিকে দেখিয়ে কাকাবাবুকে নিয়ে আসছি মার ঘরে।"

অগত্যা শান্তনু চলে যায় মায়ের ঘরের দিকে আর সান্ত্বনার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে আমি উঠে আসি ওপরে। জনারণ্য ও কোলাহলমুখর বারান্দা পেরিয়ে পুরু ও নরম কার্পেটে আচ্ছাদিত, উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত ও ফুলের সৌরভে আমোদিত একখানি ঘরে। নানা পোষাকের নানা বয়সের মেয়েরা সবাই ঘিরে ছিল নতুন বৌকে। তাদের ঠেলে-ঠুলে পথ তৈরি করে সান্ত্বনা। তার ব্যস্ততায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে সবাই। সান্ত্বনা আমাকে এনে হাজির করে নতুন বৌয়ের সামনে। মখমলে মোড়া ফুলের সিংহাসনে রাজরানীর মত বসেছিল মেয়েটি। সত্যিই রাজরানী। দেখতে সুন্দর, পোষাক সুন্দর, পরিবেশ সুন্দর, চারিদিকের সৌন্দর্যের মধ্যে সুন্দরতর হয়ে বিরাজ করছে নব-বধূ। সান্ত্বনার ইসারায় সে আমাকে প্রণাম করে, সান্ত্বনা পরিচয় দেয়, "কাকাবাবু।"

"জানি," মেয়েটি ঘাড় নেড়ে কোমল কণ্ঠে জানায়।

"কেমন করে তুমি আমাকে জানলে মা" প্রশ্ন করি তাকে।

"শুনে।" সে সান্ত্বনাকে দেখিয়ে দেয়।

"ওরে দুষ্টু মেয়ে, এরই মাঝে গোয়েন্দাগিরি করে জেনে নিয়েছ সব।" কৃত্রিম তিরস্কার করি তাকে। সে মুচকি হাসে। হাসে সান্ত্বনা ও অন্যান্য মেয়েরা। আমারও হাসি পাচ্ছে। ইচ্ছে করছে এই অনাবিল আনন্দের স্রোতে ভেসে আমিও গিয়ে নোঙ্গর করি এমনি কোন আনন্দের ঘাটে, কোন চিরসুন্দরের জগতে।

জানালা দিয়ে নজর পড়ে বাইরে। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র। তার স্নেহময়ী স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়েছে তাপদগ্ধ পৃথিবীর দেহে। জুড়িয়ে দিচ্ছে বিশ্বের সকল যন্ত্রণা। কিন্তু আমার বুকের মাঝে এমন করছে কেন? এত শান্তির মধ্যেও আমি শান্তি পাচ্ছি না কেন? কেন, কেন, কেন?

বিগত বিশ বছরের নানা স্মৃতি আমার বন্ধ-দুয়ারে এসে একযোগে আঘাত করতে চাইছে। স্মৃতির সমুদ্রে অবগাহন করতে চাইছে মন। একজন মহান দেশপ্রেমিক ও এক কর্তব্য-পরায়ণ কুলবধূর কথা মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

পনেরোই আগষ্ট, উনিশ শ সাতচল্লিশ। নয়ই আগস্ট উনিশ শ বিয়াল্লিশের শপথ সফল হল। ভারত স্বাধীনতা পেল। আমরা মুক্তি পেলাম।

সঞ্জয়দার সঙ্গে জেল-ফটকের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। তিনটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে একজন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়েছিলেন জেল-ফটকের সামনে। ছেলেটির বয়স বছর তেরো, মেয়ে দুটি আরও ছোট। সঞ্জয়দা ওদের দেখেই থমকে দাঁড়ালেন, তারপরে একটু মৃদু হাসলেন। ভদ্রমহিলা ছেলেমেয়েদের যেন কি বললেন। তারা আমাদের দুজনকে প্রণাম করল। আমিও এগিয়ে গিয়ে

ভদ্রমহিলাকে প্রণাম করতে চাইলাম, তিনি বাধা দিলেন। সঞ্জয়দা হাসতে হাসতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভদ্রমহিলা গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলেন সঞ্জয়দাকে। প্রণাম শেষে আমাকে দেখিয়ে সঞ্জয়দা জিজ্ঞেস করলেন তাকে, "বলতো এ কে ?"

"বারে আমি বুঝি জানি না, এই তো আমার ঠাকুরপো। চিঠি পড়ে যেমনটি ভেবেছিলাম, ঠিক তেমনি।"

সেখানে দাঁড়িয়েই আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। সব কথা মনে নেই আজ। শুধু মনে আছে একসময় বলেছিলাম, "এবারে কিন্তু আমাকে বিদায় দিতে হবে বৌদি। দেরি হলে গয়নার নৌকা পাব না।"

"কোথায় যাবেন !"

"বাড়ি। নৌকায় মাইল পনেরো পথ। বিকেলের গয়নায় চাপলে কাল সকালে পৌঁছাব।"

"সেখানে তো শুনেছি কেউ পথ চেয়ে বসে নেই।" বৌদি পরিহাস করতে চান।

"ঠিকই শুনছেন। বাপ-মা বিদায় নিয়েছেন শৈশবে। জ্যাঠামশাই মানুষ করার চেষ্টায় বড় করেছেন আমাকে। কিন্তু মানুষ হই নি বলে শোকে দুঃখে ইহলোক ত্যাগ করে মুক্তি পেয়েছেন, এবারে জেলে যাবার কয়েকদিন পরে।"

"তা হলে সেখানে যাচ্ছেন কেন ?"

"যাবার আর কোন জায়গা নেই বলে।"

"আপনার ওপর আমার কোন দাবি নেই ঠাকুরপো। দাবি আমি করতেও চাই না, কারণ জানি তাতে শুধু নিরাশই হব। তবে আপনার কাছে আমার অনুরোধ অন্ততঃ একটা দিনের জন্য গরীব দাদার বাড়িতে আপনাকে পায়ের ধুলো দিতেই হবে।"

বড় আশা করেছি আপনাদের ত্বজনকে এক সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াব।"

সঞ্জয়দার ছেলে ও বড় মেয়েটি কখন এসে আমার ত্বটি হাত দখল করেছে খেয়াল করি নি। মা চুপ করার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি বলে, "কাকা আমাদের বাড়ি চলুন।"

"আপনাকে আমাদের বাড়ি যেতেই হবে।" বড় মেয়েটি বলে। হাত দখল করতে না পেরে ছোট মেয়েটি এসে আমার পাঞ্জাবি পাকড়াও করেছে। টান্‌তে টান্‌তে বলে, "তুমি আমাদের বাড়ি থাকবে, রোজ গল্প বলবে। ডাকাতের গল্প।"

সঞ্জয়দা আমার অবস্থা দেখে মুচকি হাসছেন। বৌদি সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন আমার মুখের দিকে।

এরপর আর প্রতিবাদ চলে না। প্রতিবাদের প্রয়োজনই বা কি? বাড়ি যেতে চাইছি, যাবার অন্য কোন জায়গা নেই বলে। যাবার কোন দরকার নেই। সেখানে কেউ আমার পথ চেয়ে বসে নেই। আপনজন যাঁরা আছেন, তাঁরা আমি না গেলেই খুসি হবেন। একে তো জেলখাটা মানুষ, তার ওপরে ভাগের সম্পত্তি। সঞ্জয়দা জেলে বসেই আমাকে তাঁর বাড়ি যেতে বলেছেন, রাজী হই নি। তিন তিনটি ছেলেমেয়েকে মানুষ করছেন এক অসহায়া রমণী। কত কষ্টেই না জানি তাকে সংসার চালাতে হচ্ছে। ভেবেছি তার চেয়ে দেশে যাই। সরকারী হাতখরচ থেকে সঞ্চয় করা যে কটি টাকা এখনও আছে তাই দিয়ে কিছুদিন চালিয়ে নেব। তারপরে একটা কাজকর্ম দেখে নেব। দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য এতদিন লড়েছি, ত্ব বেলা চারটি ভাত যেমন করে হোক যোগাড় হয়ে যাবে। তাছাড়া এবারে নিশ্চয়ই উপবাসের পাট চুকল আমার দেশের মাটি থেকে।

কিন্তু বৌদি এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্য আমাকে শেষ পর্যন্ত উঠতে হল ঘোড়ার গাড়িতে। বৌদি গাড়ি নিয়েই এসেছিলেন। ঘোড়া চলল পরিচিত পথে—ইট আর সুরকির লাল পথ। এখনও লাল। কিন্তু রক্তপাতের দিন যে ফুরোল। রক্তের বদলে যে স্বাধীনতা আনতে চেয়েছি সেই স্বাধীন দেশের পথ দিয়ে চলছি—গাড়ি চলেছে। মুক্ত আমরা—মুক্তির নিশ্বাস নিচ্ছি। হোক্‌গে পাকিস্তান তবু তো স্বাধীন। নামে কি আসে যায়, আমার দেশের মানুষই তো দেশের শাসক হয়েছে।

সেবারে তিন দিন ছিলাম সঞ্জয়দার বাড়িতে। দুঃখিনী মা বহুকষ্টে এ ক'বছর ধরে মানুষ করেছেন ছেলেমেয়েদের। নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ওরা। যেমনি মেধা তেমনি স্বভাব। খুব ভাল হয়েছে সঞ্জয়দার ছেলেমেয়েরা। কথায় কথায় একদিন বৌদি বলেছিলেন তাঁর বিগত পাঁচ বছরের ইতিহাস, "জজসাহেবের রায়দান শেষ হল। পুলিসভ্যানে করে আপনার দাদাকে নিয়ে গেল জেলে। ফিরে এলাম বাড়িতে। বাড়িতে ঢোকার আগে চোখের জল মুছে ফেললাম। শান্তির চোখ মুছিয়ে দিলাম। কান্না দেখলে মা আরও অস্থির হয়ে পড়বেন। কিন্তু লাভ হল না কিছু। পাড়ার লোক আগে ভাগে এসে তাঁকে খবর দিয়ে গিয়েছিল। আমাদের দেখেই তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সারারাত বসে থাকলাম তাঁর শিয়রে। জ্ঞান আর অজ্ঞানতার মধ্যে কাটল রাত। জলটুকু মুখে দেওয়াতে পারলাম না। পরদিন সকালে একটু সুস্থ হলে কত বোঝালাম তাঁকে—এ জেল সম্মানের। এতে চোখের জল ফেললে তাঁর ছেলের অকল্যাণ হবে, দেশের অকল্যাণ হবে। তিনি বললেন—কিন্তু ওরা যে মিথ্যে অপরাধের জন্য শাস্তি দিল খোকাকে। ওরাও তো মানুষ বৌমা, ওরা একবার ভাবল না তোমাদের

কথা। একবার চিন্তা করল না, খোকা না থাকলে কি হবে, কে দেখবে আমাদের ?

"উত্তর দিলাম—ভগবান।

"মা সন্তুষ্ট হতে পারেন না। বুড়ো হলেও ঠাকুর দেবতার প্রতি খুব একটা ভক্তি ছিল না তাঁর। তিনি বলতেন, আপনার দাদাই নাকি তাঁর গোপাল। যাই হোক দিন দিন মার শরীর খারাপ হয়ে পড়ল। তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হলেন। তারপর—তারপর একদিন পালিয়ে গেলেন আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে। এতদিন তবু যা হোক তিনি ছিলেন এবারে আমি একেবারেই অসহায়। আমি একা, কিন্তু নিরাশ হলাম না, তিনটি অবোধ শিশুকে মানুষ করতে হবে। আমার ভেঙে পড়লে চলবে না। সাহসে বুক বাঁধলাম। কিন্তু কেমন করে চারটি প্রাণীর মুখের অন্ন যোগাড় করব। দাদারা লিখলেন তাঁদের কাছে গিয়ে থাকতে। কিন্তু তাই বা কেমন করে হয় ? এতো এক আধ-দিনের কথা নয়। পরের গলগ্রহ হয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে পারব না। তা ছাড়া শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে চলেই বা যাই কেমন করে ! কিন্তু পেট চালাতে হবে তো। প্রথমে চাকরি-বাকরির চেষ্টা করলাম কিন্তু কে আমাকে চাকরি দেবে ? রাজ-বন্দীর স্ত্রীকে চাকরি দেওয়া মানে রাজদ্রোহী হওয়া। অনন্যোপায় হয়ে বাজারের দর্জিদের শরণাপন্ন হলাম। বিয়ের সময় বাবা একটা সিঙ্গার মেশিন দিয়েছেন। তাকেই আমার রোজগারের হাতিয়ার বানিয়েছি। এখন আর আমাকে বাইরে যেতে হয় না। দর্জিরাই বাড়িতে কাজ দিয়ে যায় ও নিয়ে যায়। শুনলে বোধ হয় আপনি একটু অবাকই হবেন ঠাকুরপো ! আমার কোন আর্থিক অভাব নেই।"

তিন দিন পরে চলে গেলাম দেশে। প্রায় মাসখানেক ছিলাম

দেশের বাড়িতে। মোটেই ভাল ছিলাম না। প্রতি মুহূর্তেই উপলব্ধি করতাম যাই কেন না করে থাকি দেশের জন্য, যত কষ্টই পেয়ে থাকি ইংরেজের কারাগারে, দেশ আমাকে চায় না, দেশের মানুষ আমাকে ভালবাসে না। ইংরেজ আমাকে নিজদেশে পরদেশী করে দিয়ে গেছে। স্বার্থান্বেষীদের প্ররোচনায় আমার সরল প্রতিবেশীরা আমাকে আর আপনার জন মনে করে না। আত্মীয়রা সবাই দেশত্যাগী হয়েছেন। যারা আছেন তাঁদের যাবার জায়গা নেই। তাঁরা নিরুপায়, তাঁরা দুর্বল। প্রাণ খুলে কথা বলার সাহসটুকু হারিয়েছেন তাঁরা। প্রতিবেশীদের কেউ কেউ পরামর্শ দেয় দেশ থেকে পালিয়ে যেতে। দুঃখ পাই— যে স্বাধীনতার জন্য পলাশী থেকে ম্যাডান স্ট্রীট পর্যন্ত রক্তগঙ্গা বয়ে গেল, সিরাজ ও রামেশ্বর শহীদ হল, সুখের সংসারকে ভাসিয়ে দিয়ে সঞ্জয়দারা কারাগারে ঠাঁই নিলেন—এই কি সেই স্বাধীনতা? কেন তবে আশৈশব ইংরেজ বিতাড়নের স্বপ্ন দেখেছি, কেন তবে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ করেছি, নিজের কথা না ভেবে দেশের কথা ভেবেছি?

অবশেষে যা ছিল আমার কল্পনাতীত, যার চেয়ে লজ্জাকর ও হেয় আর কিছুই হতে পারে না, তাই করতে হল আমাকে। কুপুত্রের মত আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমিকে পরিত্যাগ করে চোরের মত পালিয়ে এলাম শহরে—সঞ্জয়দার বাড়িতে। জ্ঞানলাভের পর থেকে যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে এসেছি, সেই স্বাধীন দেশে আমার ঠাঁই হল না।

তখনও রাতের আঁধার কাটে নি। জনহীন লাল সুরকির পথ। পথের মাঝে মাঝে জল জমে আছে। ইট জেগে আছে। রাস্তায় আলো থাকলেও সে ক্ষীণ আলোতে পথ আলোকিত নয়। অন্ধকারে হোঁচট্ খেয়ে, জলে ভিজে, একসময় শ্রান্ত চরণে এসে

পৌঁছালাম সঞ্জয়দার বাড়ির সামনে। ক্লান্ত হাতে কড়া নাড়লাম। সঞ্জয়দা বোধকরি তখন উঠেছিলেন ঘুম থেকে। জেলেও দেখেছি তিনি রোজ শেষ রাতে শয্যা ত্যাগ করেন। উঠে সুর করে গীতা পাঠ করেন।

দরজা খুলে বিস্মিত হলেন সঞ্জয়দা। কিন্তু আমার এই অসময়ে আগমন যে স্বাভাবিক নয়, তা অনুমান করতে তাঁর দেরি হল না। আমি ভেতরে ঢুকলাম। সঞ্জয়দা দরজা বন্ধ করে দিলেন। দুজনে এসে বৈঠকখানায় বসলাম। বৌদিকে ডেকে তুললেন সঞ্জয়দা। আমার জন্য জামা-কাপড় এল। স্টোভে চা তৈরি হল। দু কাপ চা টেবিলের ওপর রেখে বৌদি বসলেন একখানি চেয়ারে। বললেন, "এবার বলুন কি ব্যাপার? হঠাৎ এরকম ভাবে দেশ থেকে চলে এলেন কেন?"

সব শুনে বৌদি চুপ করে থাকলেন। সঞ্জয়দা জিজ্ঞেস করলেন, "কি করবে? এখানে থাকবে, না দেশ ছেড়ে পালাবে?"

"এখানে থাকাও নিরাপদ নয় সঞ্জয়দা।"

"তা হলে পালাবেই ঠিক করেছ। কিন্তু কোথায়?"

"কলকাতায়।"

"গোটা দেশটাই যদি কলকাতায় গিয়ে উপস্থিত হয়, তবে সেখানে ঠাঁই মিলবে কেমন করে? তাছাড়া যে দেশের স্বাধীনতার জন্য জ্ঞানলাভ করার পর থেকে সংগ্রাম করলে, সে দেশ তো শুধু কলকাতাকে নিয়ে নয়, পশ্চিমবঙ্গকে নিয়েও নয়, তার মধ্যে যে তোমার আমার এই হতভাগ্য জন্মভূমিরও একটা স্থান আছে।"

"আগে ছিল সঞ্জয়দা, কিন্তু এখন নেই!"

"না। এখনও আছে, তোমরাই সব কাপুরুষের মত পালিয়ে গিয়ে তার অধিকারকে সঙ্কুচিত করছ।"

"তবে কি আপনি আমাকে পাকিস্তানের জেলে যেতে বলেন? কিন্তু কেন এই মিথ্যে শাস্তিকে মাথা পেতে নিতে বলেছেন?"

"ইংরেজের মত শক্তিশালী জাতি যখন শাস্তি দিয়ে সত্যকে মেরে ফেলতে পারে নি, তখন এরাও পারবে না।"

আমি জবাব দেবার আগেই বৌদি বলে উঠেছিলেন। "ইংরেজ সত্যকে মারতে পারে নি, কিন্তু বহু সত্যাশ্রয়ীকে মেরে ফেলেছে। সর্বোপরি ধর্মের মিথ্যে প্রাচীর তুলে দিয়ে তবে এ দেশ ত্যাগ করেছে। আদর্শের চেয়ে বাস্তবের মূল্য অনেক বেশি। মানুষকে নিয়েই দেশ। দেশের অধিকাংশ মানুষ যখন মিথ্যেকে মেনে নিয়েছে, তখন মুষ্টিমেয় লোকের পক্ষে সত্যকে আঁকড়ে থাকার নাম নির্বুদ্ধিতা।"

আমি চুপ করে থাকি। সঞ্জয়দাও চট করে কোন জবাব দেন না। একটুকাল চুপ করে সহসা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বৌদিকে প্রশ্ন করেন, "তোমাকে কে বলল যে এ দেশের মানুষ আমাদের চায় না।"

"বলেছে বিগত কয়েকমাসের বিভিন্ন স্থানের দাঙ্গা। তুমি কি এখনও বলবে, যারা সে সব জায়গায় অকারণে দাঙ্গা বাধিয়েছে, তারা তোমাদের ভালবাসে।"

"নিশ্চয়ই। অশিক্ষিত সরল জনসাধারণকে উদ্দেশ্যপরায়ণ স্বার্থপর লোকেরা ভুল বুঝিয়েছে বলেই দাঙ্গা বেধেছে। পালিয়ে গেলে এর প্রতিবিধান হবে না। এ অবস্থায় প্রতিবিধান করতে হলে এখানেই থাকতে হবে। জনসাধারণকে বোঝাতে হবে, ধর্ম আলাদা হলেও আমরা তাদের পর নই। শত শত মাইল দূরের বিহার, পাঞ্জাব ও সিন্ধু থেকে এখানে এসে যারা ওদের শাসন করছে, তারা আমাদের থেকে আপন নয়।"

"কিন্তু বুঝে ওঠবার আগেই যদি তারা তোমাদের মুছে ফেলতে

চায় এ পৃথিবী থেকে?" বৌদির কণ্ঠস্বর কর্কশ। মনে হচ্ছে তিনি একটু রেগে গেছেন।

"তা হবার নয় সরমা! ভুলে যেও না মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের স্মৃতিধন্য এই শহরের বুকেই প্রথম বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পতনের বীজ উপ্ত হয়েছিল। সেদিন কেউ ধর্মের দোহাই দেয় নি। সকল প্রকার বিভেদ ভুলে দেশবাসী দেশের স্বাধীনতার জন্য নির্ভয়ে বন্দেমাতরম্ আকাশ বাতাস ব্যাপ্ত করে তুলেছিল। পুলিসের লাঠির আঘাতে ষোলো বছরের ছেলের মাথা ফেটেছে—রক্ত ঝরেছে, কিন্তু বন্দেমাতরম্ বন্দনা বন্ধ করে নি। আজ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে তাদের সেই আত্মত্যাগের অবমাননা করব? সত্য, প্রেম, পবিত্রতার তীর্থভূমি এই শহর—আজ পর্যন্ত এখানে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নি, হবেও না কোন কালে, এ কথা আমি তোমাকে লিখে দিতে পারি সরমা।"

লিখে নেন নি বৌদি। কিন্তু সঞ্জয়দার কথা মিথ্যে হয়েছে। আর সেই মিথ্যের ঋণ শুধতে হয়েছে বৌদিকে সারা জীবন ভরে। জেলের ভয়ে, প্রাণের ভয়ে আমি পালিয়ে এসেছি কলকাতায়। ব্যস্ত হয়ে পড়েছি নিজেকে নিয়ে। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে চাকরি ও আস্তানার জন্য। অবশেষে একজন মাড়োয়ারী মহাজনের গদীতে খাতা লেখার একটা কাজ যোগাড় করেছি। মধ্য কলকাতার এক অন্ধ গলিতে একখানি অন্ধকার ঘরও পেয়েছি। দিনগত পাপক্ষয় করছিলাম কোনমতে। মাঝে মাঝে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হত সঞ্জয়দার সঙ্গে। দেশের অবস্থার কথা কোনদিন তিনি লিখতেন না। কিন্তু এখানকার অবস্থা সবসময়েই জানতে চাইতেন। যথাসম্ভব জানাতাম তাঁকে। তিনি লিখতেন—হিন্দুস্থানে মুক্তির চেয়ে পাকিস্তানের কারবাসও যে দেখছি তোমার অনেক ভাল ছিল হে!

আমি সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতাম। ভাবতাম, তিনি ভালই আছেন। ভাল চাকুরি করছেন। ছেলেমেয়েরা লেখা-পড়ায় ভাল হয়েছে। কলকাতায় না এসে বোধ হয় তিনি ভালই করেছেন। মনে মনে খুশী হতাম। ওদের ভাল হলেই আমার ভাল।

কিন্তু ভাল কি আমার অদৃষ্টে বেশিদিন সয়। উনিশ শ পঞ্চাশের এক বর্ষণসিক্ত প্রভাত। আকাশের কান্না তখন থেমেছে বটে কিন্তু যে কোন সময় আবার শুরু হতে পারে। রান্না চড়িয়ে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বসেছি। ভাবছি আবার বৃষ্টি নামলে অফিসে যাব কেমন করে? এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। কে এলো এই ঝড় জলের মধ্যে? কাগজখানা রেখে দিয়ে দরজা খুলি।

"কে?" খুবই চেনা চেনা লাগছে মুখখানি। কিন্তু ঠিক চিনতে পারছি না।

"প্রণাম করতে পারব না। এ সময় প্রণাম করতে নেই কিনা। কেমন আছেন কাকাবাবু।"

কাকাবাবু? কে? অনেকটা ····

"চিনতে পারছেন না। আমি শান্তনু।"

"কিন্তু তুমি কোথা থেকে? এ বেশে···সঞ্জয়দা?"

"·· নেই। বাবা নেই কাকাবাবু।"

শান্তনুর কণ্ঠস্বর কান্নায় স্তব্ধ হয়ে আসে। আমিও চুপ করে থাকি। আমার চোখও কি জলে ভরে উঠেছে নাকি? ছিঃ ছিঃ এ আমি কি করছি। ও আমার কাছে এসেছে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ প্রয়োজনে। আমি ছাড়া ওদের আর কেই বা আছে? কোথায় আমি ওকে সান্ত্বনা দেব, সাহায্য করব, সহায়ক হব। তা নয়, আমি নিজেই কাঁদতে শুরু করেছি। চোখ মুছে ওর

একখানি হাত হাতে নিই। হাত ধরে শান্তনুকে ভেতরে নিয়ে আসি। আসনখানি পেতে দিই তক্তপোশের ওপর।

সঞ্জয়দা নেই। কত লোকই তো থাকে না। এমনি অতর্কিতে একদিন চলে যায়। বিদায় বেলায় একবার ভেবেও দেখে না তার কাজ শেষ হল কি না? যে যায়, সে ভালই যায়। যাদের রেখে যায়, তারাই কেঁদে কেটে সারা হয়। কাঁদতে কাঁদতে বলে—বড় শিগ্গীর চলে গেল, বড় অসময়ে চলে গেল। আরও কিছুদিন থাকতে পারত। থাকলে ভাল হত। তোমার ভালো, আমার ভালো—সবার ভালো।

তবুও মানুষ থাকে না। ডাক এলে এত সব ভালোকে অবহেলা করে সে চলে যায়। দুঃখ হয়, কষ্ট হয়। কিন্তু এই যাওয়াকে মেনে নিতে হয়। কষ্ট হচ্ছে সঞ্জয়দার জন্য, তবু তার যাওয়াকে মেনে নিতে হবে। এ যাওয়া স্বাভাবিক নয় জেনেও মেনে নিতে হবে। পরিবার-পরিজনের কথা না ভেবে একদিন যিনি দেশের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, কারাবরণ করেছিলেন, শত অনুরোধেও যিনি সেই দেশের মাটি ছেড়ে নড়েন নি, সেই দেশের মানুষই ধর্মের নামে তাকে প্রকাশ্য রাজপথে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তবু আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে এই দেশপ্রেমিকের অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত অন্যায় মৃত্যুকে।

শান্তনুর কথায় বুঝলাম বৌদিও মেনে নিয়েছেন এই মৃত্যুকে। যা গেছে তার জন্য দুঃখ না করে, যা আছে তাই নিয়ে তিনি বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন। আশ্চর্য! নইলে একজন অতি সাধারণ বাঙালী নারীর পক্ষে স্বামীর এই আকস্মিক অপমৃত্যুর পরেও কেমন করে সুস্থ মাথায় নাবালক ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে আসা সম্ভব হল? স্বামী নেই, স্বামীর ভিটে নেই, অর্থ নেই, ইজ্জত নেই—কিন্তু তিনি বাঁচতে চাইছেন, ছেলেমেয়েদের

বাঁচাতে চাইছেন। তিনি ভেঙে পড়েন নি, পাগল হন নি, আত্মহত্যা করেন নি।'

শান্তনুর সঙ্গে শেয়ালদা স্টেশনে আসি। স্টেশনের চেহারা দেখে চমকে উঠি। শত শত ছিন্নমূল পরিবার এসে ঠাঁই নিয়েছে এই সরকারী বারোয়ারীতলায়। এরা যেন দুর্ভিক্ষের দেশের লোক—দুর্ভিক্ষ লেগে আছে জল নিয়ে, জায়গা নিয়ে, খাবার নিয়ে। অথচ এত দুঃখের মধ্যেও গলাবাজির কমতি নেই। সুযোগ পেলেই বিগত দিনের কথা বলে, ফেলে আসা ঐশ্বর্যের হিসাব দিয়ে অন্যের বাহবা নেবার বৃথা চেষ্টা করছে। অথচ পরমুহূর্তেই ছেলেমেয়েকে কৌতূহলী জনতার কাছে গিয়ে পয়সা চাইতে বলছে। আশ্চর্য মানুষ, দুরবস্থায় পড়লে কত ছোট হয়ে যায়।

এই পরিবেশের মাঝে গোটা ছয়েক টিনের বাক্স আর কয়েকটা পোট্‌লা-পুঁট্‌লির বেড়া দেওয়া হাত চারেক জায়গার মধ্যে কাঁথা ও কম্বলের একটা বিছানার ওপরে তিনটি প্রাণী বসে আছে। চোখে তাদের অচঞ্চল উদাস ও অসহায় দৃষ্টি। তারা এই ছিন্নমূল সম্প্রদায়েরই অন্যতম। এদের একদিন সব ছিল, আজ কিছু নেই। না, আছে—আছে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কি করবে, কোথায় যাবে, কেমন করে বাঁচবে? কার পাপে এই শাস্তি? না, শাস্তি নয়—স্বাধীনতার বলি। প্রতিদানে স্বাধীন ভারত তাদের কি দেবে? দেবে কি মানুষের মত বাঁচার অধিকার?

বৌদি কিন্তু আশাবাদী। তিনি বলেন, "এখানে এরকম অবস্থায় পড়তে হবে জেনেও পালিয়ে এসেছি। শুধু বাঁচতে হবে বলে নয়, ওদের মানুষ করতে হবে বলেই এখানে এসেছি।'

"কিন্তু এভাবে থাকলে তো আপনারা বাঁচবেন না বৌদি, তার চেয়ে চলুন আমার ওখানে।"

হেসে দিলেন তিনি। বললেন, "এতদিন যখন বেঁচে রয়েছি, তখন আমাদের অত সহজে মৃত্যু হবার নয় ঠাকুরপো।"

"কিন্তু এখানে যে আপনাদের বড় কষ্ট হচ্ছে।"

"কষ্টকে তো আমি কোনদিন ভয় করি নি ঠাকুরপো, করলে যে আপনার দাদা যখন জেলে গেলেন, তখনই আমার আত্মহত্যা করা উচিত ছিল। কষ্ট করেই বাঁচতে হবে। কিন্তু কেবল বাঁচলেই চলবে না, এদের মানুষ করতে হবে। তাই শান্তনুকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম। সাহায্যের জন্যই তো আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। বলছি সে কথা, তার আগে আপনি বসুন।"

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। সান্ত্বনা ও শান্তি একটু সরে আমাকে জায়গা করে দিল। শান্তনু কুশাসন পেতে পথের এক পাশেই বসে পড়ল। চারিদিকে কৌতূহলী দৃষ্টি। আমার পোষাক-পরিচ্ছদ বোধকরি এখানে এরকমভাবে বসবার উপযুক্ত নয়? অবশ্য বৌদি এবং তাঁর ছেলেমেয়েরাও একটু বে-মানান বৈ কি? তা হলেও তারা আছেন কয়েক দিন ধরে।

বৌদি বললেন, "শান্তনু এবার আই. এস. সি পাস করেছে। পরীক্ষার পরেই ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে দরখাস্ত করেছিল। আগামীকাল সেই ভর্তির পরীক্ষা, আপনি ওকে একটু নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে।"

"এতো আনন্দের কথা। নিশ্চয়ই যাবো। তবে এ হচ্ছে ছাত্র ছাঁটাইয়ের পরীক্ষা, খুব কঠিন। পড়াশুনা করা দরকার।"

"শান্তনু যতটা সম্ভব পড়াশুনা করছে।"

"এখানে পড়াশুনা করছে?" বিস্মিত হই।

"হ্যাঁ," বৌদি উত্তর দেন, "করছে বৈ কি।"

"কখন?"

"রাতে। বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত। ঐ সময়টা এখানে খুব নিরিবিলি থাকে।"

"কিন্তু এভাবে রাত জাগলে যে ওর অসুখ হয়ে পড়বে।"

"অসুখ হবে কেন? এর চেয়ে অনেক কষ্ট করে লোক মানুষ হয়েছে।" একটু থামলেন বৌদি, শান্তনুর দিকে চেয়ে আবার বললেন, "'বিদ্যাসাগর মশাই যে রাস্তার আলোর নিচে দাঁড়িয়ে পড়াশুনা করেছেন, এ কথা তো আপনার অজানা নয় ঠাকুরপো।"

শান্তনুদের সেই দিনগুলোর কথা আমি আজ ভুলতে পারি না। দেশের জন্য মানুষ কষ্ট করে। কিন্তু দেশের জন্য একটা গোটা জাতি তিল তিল করে ক্ষয় হয়ে যায়, এ নজীর কি খুব বেশি আছে পৃথিবীতে? সবচেয়ে দুঃখের কথা ক্ষয়িষ্ণু এই সমাজকে নিয়ে কোন কাব্য, কোন ইতিহাস লেখা হল না। গরম গরম বক্তৃতার উপকরণ হওয়া ছাড়া আর কিছু হতে পারল না এরা।

শেষরাতে ঘুম থেকে উঠতে হত ওদের, নইলে কলঘরে জায়গা পেত না। তারপর থেকে সেই স্বল্প পরিসর গণ্ডির মধ্যে সারাদিন আবদ্ধ থাকা। বেলা নটা নাগাদ মিলতো দুমুঠো চিড়ে আর গুড়। স্নানের পাট ওরা শেষ করে রাখতো সেই শেষ রাতেই। অসহ্য গরম লাগত দুপুরবেলা, কিন্তু তখন স্টেশনের কলতলা লোকে লোকারণ্য। যাত্রী ও বাস্তুহারাদের ভিড়ের ভয়ে ওরা আর সেদিকে পা বাড়াত না। ক্রমবর্ধমান বাস্তুহারাদের সংখ্যা। রোজই তারা আসছে। এ ছাড়া ঝগড়া-ঝাটির ভয়ও ছিল বৈ কি। জল নিয়ে ঝগড়া, জায়গা নিয়ে ঝগড়া, খাবার নিয়ে ঝগড়া, ইজ্জত নিয়ে ঝগড়া। আশ্চর্য! ইজ্জত নাকি অবশিষ্ট ছিল তখনও। সকলেই দুঃখী কিন্তু কেউ কারও দুঃখ বুঝত না। খাবারের ডাক পড়ত বেলা গড়িয়ে গেলে। লঙ্গরখানার সামনে থালা হাতে নিয়ে সারি বেঁধে বসতে হত মাটিতে সবাইকে। কোনদিন ডাল-ভাত, কোনদিন খিচুড়ি। শিশুদের জন্য

গোলা গুঁড়ো-দুধ পরিবেশনের ব্যবস্থা ছিল। এই গোলা-দুধ নিয়েই একদিন গোল বাধল।

সঞ্জয়দা বাড়িতে গরু পালতেন। ওরা রোজ দুধ-খেত। এখানে আসার পর থেকে আর দুধ জোটে নি। শান্তনু ও সান্ত্বনা বড় হয়েছে। তারা সবই বুঝতে পারত। কিন্তু শান্তি বুঝত না। সে তখন খুবই ছোট। সেদিন বৌদির শরীরটা ভাল ছিল না। তিনি শুয়েছিলেন। হঠাৎ একটা গোলমাল শুনে উঠে বসলেন বৌদি। শান্তি কাঁদছে। সবার অলক্ষ্যে শান্তি কখন যেন গিয়ে দুধের লাইনে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে দুধ নিয়ে ঝগড়া হয়েছে একটি মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটির বাবা ছিল কাছেই। সে ঝগড়া না থামিয়ে শান্তিকে ধরে মেরেছে। গোলমালের গন্ধ পেয়ে উপস্থিত কয়েক-জন চড়াও হয়েছে সেই লোকটির ওপরে। ফলে একটা রক্তাক্ত পরি-স্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আর স্বাভাবিকভাবেই পুলিসের হস্তক্ষেপ। সমস্ত অশান্তির মূলে শান্তি। তাই পুলিস শান্তির মাকে সতর্ক করতে এসেছে। লজ্জায় ঘৃণায় বৌদি মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চান। একি বিশ্রী পরিবেশ? এখানে বাস করে তিনি ছেলেমেয়েদের মানুষ করবেন কেমন করে? তার সব স্বপ্ন যে মিথ্যে হয়ে যাবে।

পরদিনই বৌদি ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে আসেন আমার বাড়িতে। আমি বিস্মিত হয়েছিলাম, কারণ ইতিপূর্বে আমি বহু চেষ্টা করেও তাঁকে আনতে পারি নি আমার বাড়িতে। আমার কষ্ট হবে ভেবে তিনি আমার গলগ্রহ, হতে রাজী হন নি। কারও গলগ্রহ হয়ে নাকি ছেলেমেয়েদের মানুষ করা যায় না।

তবে তিনি বেশিদিন আমার বাড়িতে থাকেন নি। নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন কয়েক মাসের মধ্যে। মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি থেকে একটা সেলাইয়ের কল যোগাড় করে তার পুরনো বৃত্তিকে সম্বল করেছেন। তার পরে নিজে বাসা করেছেন। অমানুষিক

পরিশ্রম করেছেন। দিনরাত খেটেছেন। ছেলেমেয়েরাও মার এই জীবন-যুদ্ধে মার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। শান্তনু নিয়মিত প্রাইভেট টিউসনি করেছে, সান্ত্বনা ও শান্তি সাধ্যানুযায়ী মাকে সাহায্য করেছে। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন তিনি। আজ তাঁর ছেলে-মেয়েরা মানুষ হয়েছে। আজ শান্তনু সংসারী হচ্ছে, বৌদির আজ কতবড় আনন্দের দিন। পরিচিত হবার পর থেকে যাকে কেবল দুঃখ পেতেই দেখেছি, আজ নিশ্চয়ই তিনি হাসছেন। প্রাণভরে হাসছেন।

শান্তনুর ডাকে বাস্তবে ফিরে আসি। কবার যেন ডাক দিয়েছে। সাড়া না পেয়ে নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছে, বিস্মিত হয়েছে সান্ত্বনা ও অন্যান্য সবাই। কে কি ভেবেছে কি জানি।

শান্তনু বলে, "চলুন, মার ঘরে। মা আপনার জন্য বসে আছে।"

"চল।" ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শান্তনুর সঙ্গে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি বারান্দায়। কলকোলাহল অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। শুধু আকাশের পূর্ণচন্দ্র ঠিক তেমনি রয়েছে। চাঁদের হাসির কোন পরিবর্তন হয় নি। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নায় কিছুই যে যায় আসে না ওর। বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ চিরকাল এমনি স্নিগ্ধ আলোয় বিভূষিত করেছে ভুবনকে উনিশ শ' উনিশ সালের বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদকে দেখে তাই সারা দেশের মানুষ বিস্মিত হয়েছিল। রাওলাট্ আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ অমৃতসরের মুক্তিকামী মানুষের রক্তে স্নান করে জেনারেল ডায়ার যখন ফিরে যাচ্ছিল। তখনও এমনি চাঁদের আলোয় বিশ্বভুবন আলোকিত হয়েছিল। কিন্তু সেদিনের সেই পূর্ণিমার মাঝে এমন পূর্ণতার স্পর্শ ছিল কি, যেমনটি আজ আছে এই পূর্ণ-চন্দ্রের মাঝে—শান্তনু ও বৌদির জীবনে।

বড় হলঘর পেরিয়ে পর পর তিনখানি ঘর। শেষের ঘরখানির পরদা ঢাকা, দরজার সামনে এসে একটু থমকে দাঁড়াল শান্তনু। তারপরে হাত দিয়ে পরদা সরিয়ে ধীর পদক্ষেপে ভেতরে ঢুকল। তার পেছনে আমিও ভেতরে আসি। মাঝারি আকৃতির একখানি ঘর। ঘরের কোণে নিত্য ব্যবহার্য কয়েকটি বাসন-কোসন পড়ে আছে। একপাশে মেঝেতে বিছানা পাতা, আরেক পাশে ঠাকুরের আসন। অন্যান্য ঘরের আসবাব-পত্র বা আনুষঙ্গিক উপকরণের সঙ্গে এ ঘরের কোন মিল নেই। চারিদিকের ঐশ্বর্যের মাঝে, প্রাচুর্যের মাঝে, এ যেন এক কৃচ্ছ্রসাধন ভূমি। আসনে ঠাকুর নেই। আছে সঞ্জয়দার একখানি পূর্ণাকৃতির ছবি। ছবির গলায় একটি বেলফুলের মালা। সামনে সুগন্ধি ধূপকাঠি জ্বলছে। ছবির সামনে চোখ বুজে বসেছিলেন বৌদি। সঞ্জয়দা নেই, আছে তাঁর ছবি। ছবির কান আছে। মন দিয়ে বলতে পারলে, ছবি কথা শোনে। সঞ্জয়দাকে হয়ত কিছু বলছিলেন বৌদি। বলতে বলতে তাঁর চোখে নেমে এসেছিল অশ্রুর প্রবাহ।

বৌদির পেছনে গিয়ে আস্তে আস্তে শান্তনু ডাক দেয়, "মা।"

সাড়া নেই।

শান্তনু আবার ডাকে, "মা।"

"কে?"

চোখ মেললেন বৌদি। দেখতে পেলেন আমাদের। তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। শান্তনু আবার বলে, "মা কাকাবাবু এসেছেন।"

বৌদি কিছু বলার আগেই আমি শান্তনুকে বলি, "ওদিকে এখনও বহু নিমন্ত্রিতরা রয়েছেন। তুমি বরং গিয়ে তাঁদের দেখা-শোনা কর। আমি এখানে বসছি।"

"তাই যাও বাবা। ঠাকুরপো এখানেই থাকুন।"

শান্তনু চলে গেল। বৌদি একখানি আসন পেতে দিলেন। আমি বসলাম। তিনি আর একবার চোখ মুখ মুছে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছেন ঠাকুরপো!"

"ভাল।"

"বিয়ের দিন এলেন না কেন? আপনার দাদা নেই। আপনি এলে ভাল হত।"

চুপ করে রইলাম। কেমন করে বলি দাদা নেই বলেই আসি নি। বললাম, "অফিসেব একটা কাজে হঠাৎ আটকে পড়েছিলাম।"

আমার দিকে তাকালেন বৌদি। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। বৌদি বললেন, "কিন্তু আমি ডেকে পাঠালে আপনি তো এর আগে কোন দিন কাজে আটকে পড়েন নি ঠাকুরপো।"

আমি নিরুত্তর।

বৌদি বলেন, "আমি জানি আপনি কেন আসেন নি। কিন্তু..." সহসা থেমে গেলেন তিনি। খানিকক্ষণ নীরবে কেটে যায়। আমিও অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি সঞ্জয়দার ছবির দিকে। তারপরে তিনি আবার বলেন, "ঠাকুরপো! আজকেব এই সন্ধ্যা, এই উৎসব, এত আয়োজন, এসব স্বপ্ন নয়, সত্যি!"

"হ্যাঁ" আমার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে।

"বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না আপনার।" তিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন।

"জগতে অবিশ্বাস্য বলে কিছু নেই বৌদি। দরিদ্রের পক্ষে বড় হবার অনেক বাধা। তবুও আপনার ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে কারণ তাদের বাপ মায়ের আশীর্বাদের অভাব ঘটে নি।"

"আমার কথা ছেড়ে দিন। আমার কি সাধ্য। সবই আপনার দাদার আশীর্বাদ আর আপনার উৎসাহ ও সাহায্যের ফল। তাই

সেদিন আপনি আসেন নি, আজও দেরি করছিলেন বলে আমার বড় ভয় হচ্ছিল। আপনি আশীর্বাদ না করলে, ওরা কি সম্বল করে ওদের জীবন শুরু করবে। আপনি আশীর্বাদ করুন—ওরা যেন আপনাদের মত সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার সাধক হতে পারে।"

"আমি ওদের সব সময়েই আশীর্বাদ করি বৌদি। তবে আমি জানি আমার আশীর্বাদের চেয়েও অনেক বড় আশীর্বাদ ওদের ওপর সর্বদা বর্ষিত হচ্ছে। ওদের ভাল না হয়ে পারে না।"

"আপনি বউ দেখেছেন ঠাকুরপো ?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন দেখলেন ?"

"ভাল, খুব ভাল লাগল মেয়েটিকে।"

"আপনি তো জানেন ঠাকুরপো আমিই এ বউ ঘরে এনেছি। শান্তনু নিজে দেখে নি পর্যন্ত। তাই আমার বড় ভয় ঠাকুরপো। পাছে ওরা অসুখী হয়।"

"ছি ছি, আপনি এসব ভাবছেন কেন বৌদি। আমি সান্ত্বনার মুখে শুনেছি মেয়েটির কথা। শুনেছি গরীবের মেয়ে, বি. এ. পাস, বুদ্ধিমতী ও বিনয়ী। আপনার কোন ভয় নেই বৌদি, ওরা সুখী হবে।"

হ্যাঁ। সুখী ওদের হতেই হবে। বারো বছর হল সঞ্জয়দা মারা গেছেন। এই বারো বছরের প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত বৌদি সঞ্জয়দার স্মৃতি সঞ্চয় করেছেন, যক্ষের মত আগলে আছেন সত্যবাদী স্বামীর ত্যাগ ও নিষ্ঠা। স্বামীর আদর্শে মানুষ করে তুলেছেন ছেলেমেয়েদের। কতদিন বলেছেন, "জানেন ঠাকুরপো আপনার দাদা বলতেন—বাপ-মায়ের সবচেয়ে বড় কর্তব্য ছেলেমেয়েকে মানুষ করা—ওরা মানুষ হবে কিনা জানি না, তবে আমি কোনদিন আমার কর্তব্যে অবহেলা করি নি।"

না, করেন নি। সত্যই করেন নি। বরং কর্তব্যের চেয়ে অনেক বেশি করেছেন বলেই আজ সঞ্জয়দার স্বপ্ন সত্য হয়েছে, বৌদির সকল আশা পূর্ণ হয়েছে। দুঃখের অমাবস্যা কেটে গিয়ে বৌদির জীবন আজ আনন্দের পূর্ণিমায় আলোকিত হয়েছে- বৈশাখী পূর্ণিমা।

কিন্তু বৌদির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠি। সে কি, এমন দিনে তাঁর চোখে জল! বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠি, "আজকের এই শুভতিথিতে আপনি কাঁদছেন বৌদি!"

চোখ মুছে একটু চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে তারপরে বৌদি বলেন, "হ্যাঁ ঠাকুরপো! কাঁদছি। আজ আমার গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। বিগত বিশ বছরে বহু কান্না জমেছে। আজ কেঁদে কেঁদে সেই কান্নার কবল থেকে নিষ্কৃতি পেতে হবে। আপনার দাদার দেওয়া কর্তব্য ভার বইতে গিয়ে বিশ বছর কাঁদার অবসব পাই নি। আজ আমার সব বোঝা লাঘব হল।"

আমারও চোখ দুটি সজল হয়ে উঠেছে। বাক্‌রুদ্ধ হয়েছি। আমি চুপ করে থাকি।

একটু বাদে বৌদি ডাকেন, "ঠাকুরপো!"

কোনমতে জবাব দেই, "বলুন।"

"ঠাকুরপো এবারে আমি মুক্তি চাই, আমাকে আপনাদের ছুটি দিতে হবে। আর তাই আমি আপনাকে এখানে ডেকেছি।"

একি বলছেন তিনি। সবে দুঃখ কষ্টের অবসান হল। এখন কোথায় তিনি ছেলে-বৌ ও মেয়েদেব সেবাযত্ন উপভোগ করবেন, ভবিষ্যতে নাতি-নাতনীদের সঙ্গে হেসে-খেলে জীবনেব বাকি বছরগুলি কাটিয়ে দেবেন। তা নয়, তিনি এখন সংসার থেকে ছুটি চাইছেন। বলি, "এ সব কথা কেন ভাবছেন বৌদি,

আপনার ছেলেমেয়েরা রত্ন। তারা আপনাকে যথেষ্টই শ্রদ্ধা ভক্তি করে। সারা জীবন ধরে অনেক কষ্ট করেছেন ওদের জন্য। এখন শান্তনু বিয়ে করল, এর পরে মেয়েদেরও বিয়ে হবে, সবার মাঝে শেষ জীবনটা সুখে কাটিয়ে দেবেন।"

"না ঠাকুরপো, আপনি ঠিক আমার দিকটা চিন্তা করছেন না। এতদিন আমাকে ছাড়া ওদের চলত না, তাই আমি ছুটি চাই নি। কিন্তু এখন তো ওদের আর আমাকে প্রয়োজন নেই। তাই সব মায়া কাটিয়ে সংসার থেকে এবার আমাকে পালাতে হবে।"

"কিন্তু ওরা যদি আপনাকে ছুটি না দেয়।"

"দেবে না। আমি জানি ওরা দেবে না। আর তাই আপনাকে আমার দরকার। ওরা আপনার অবাধ্য হয় না। আপনার ওদের বোঝাতে হবে।" একবার থামেন তিনি। তারপরে করুণ কণ্ঠে বলেন, "আর আপনাকেই আমার একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে ঠাকুরপো।"

"কি ব্যবস্থা বৌদি ?" আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

"কাশীতে একটা স্থায়ী ঠাঁই করে দিতে হবে আমাকে। আমি কাশীবাসী হব।"

হায় বৈশাখী পূর্ণিমা, কতটুকু তুমি জানো এজগতের ? তুমি কি জানতে, তোমাকে সাক্ষী রেখে কপিলবস্তুর প্রাচুর্যভরা প্রাসাদে একদিন যে রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, তিনি তোমাকে সাক্ষী রেখেই বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত হবেন, বিশ্ববাসীর সর্বপ্রকার দুঃখ মোচনের জন্য নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে মানুষের ভগবানে পরিণত হবেন, আবার তোমার এই পুণ্যতিথিতে নরদেহ রক্ষা করে অমরাবতীর পথে যাত্রা করবেন। তুমি কি জানতে, মনুষ্যসভ্যতার এই পুণ্যতম মুক্তিতিথিতেই মুক্তিকামী মানুষের রক্তে রাঙা হবে অমৃতসরের মাটি—জালিয়ানওয়ালাবাগ পরিণত হবে পুণ্যতীর্থে।

"তুমি কি আজ একবারও ভাবতে পেরেছ একটু পরে তোমাকে সাক্ষী রেখে যে যুবক তার জীবনের ফুলশয্যা রচনা করবে, সেই আনন্দ নিকেতনেরই আরেকখানি ঘরে তারই স্নেহময়ী জননী চোখের জলে ভাসছেন, সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত করছেন।

বৌদির দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি করুণ চোখে চেয়ে আছেন। হয়ত আমারই উত্তরের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। আমি স্থিরকণ্ঠে তাঁকে আশ্বাস দিই, "জীবনে আপনার কোন কাজেই লাগতে পারি নি বৌদি। এই সামান্য আদেশটুকু নিশ্চয়ই পালন করব। আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাব ওদের। আপনার কাশীবাসের সব ব্যবস্থা করে দেব।"

আনন্দে বৌদির চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও উজ্জ্বলতর কি ?

চিরন্তনী

সুতপা পর্দার ফাঁক দিয়ে ছেলেটিকে দেখে আর ভাবে।

ছেলেটি রোজ সকালে এমনি সময় দোকানে আসে। সুতপাদের বাড়ি ছাড়িয়েই দোকান— মুদি ও মনোহারী দোকান। ছেলেটি ছোট ছোট পা ফেলে ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে দোকানে যায়। একটু বাদে জিনিস নিয়ে বাড়ি ফেরে। সুতপা তাকিয়ে তাকিয়ে ছেলেটিকে দেখে আর ভাবে—এতটুকু ছেলেকে ওর মা কেন দোকানে পাঠায়? এ গলিতে যদিও তেমন গাড়ি ঘোড়া চলে না, তবু কি বাড়িতে আর কেউ নেই? তাছাড়া যা কিনে নিয়ে যায়, তা কি ওকে দিয়ে না নিলেই নয়? ছেলেটি সাধারণত সিগারেট, দেশলাই ও পাঁউরুটি নিয়ে যায়। পাঁউরুটি তো বোঝা গেল, কিন্তু সিগারেট? নিশ্চয়ই ওর বাবার জন্য। মানুষটার ওপর ভারী রাগ হয় সুতপার। দোকানে আসার যোগ্যতা নেই, নেশার শখ ষোল আনা। কুঁড়ের বাদশা আর কি। আর ওর মা-ই বা কেমন? এই একরত্তি ছেলেটাকে বাপের নেশার রসদ যোগাড় করার কাজে লাগিয়েছেন। তবে তিনি ভাগ্যবতী। এমন সুন্দর ছেলে যাঁর, তাঁর সৌভাগ্যের কথা ভাবলে ঈর্ষা হয় সুতপার।

দরিদ্র পিতার একমাত্র সন্তান সুতপা। দশ বছর আগে স্কুল ফাইনাল পাস করে লেখাপড়ার সঙ্গে পাট চুকিয়েছে—হেঁশেলে ঢুকেছে। তখন মা অবশ্য বলতেন, ঘরকন্নার কাজ শিখছে। গরীবের মেয়ে কলেজে পড়ে কি হবে? তার চেয়ে সংসার করা শিখুক। সেই থেকে সুতপা সংসার করাই শিখছে, কিন্তু সংসার তার আজও হয় নি।

বাপ-মা কিন্তু চেষ্টার কসুর করেন নি। এই দশ বছরে কম করেও বিশ বার তাকে সেজে-গুজে পরীক্ষকদের সামনে উপস্থিত হতে হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষায় সে আজও পাস করে নি। রূপের অভাবে নয়, রুপোর অভাবে। সুতপা সুন্দরী হলেও, তার বাবার অবস্থা মোটেই সচ্ছল নয়।

বাবা ন'টার সময় অফিসে বেরিয়ে যান। তারই মধ্যে রান্না করে দিতে হয় তাঁকে। জল তোলা, বাসন মাজা, ঘর ধোয়ানো, উনোন ধরানো—কত কাজ। দুখানি ঘর নিয়ে ওদের বাড়ি। পূবদিকের ঘরখানিতে মা-বাবা থাকেন। পশ্চিমের ঘরখানি সুতপার। একপাশে একটি চৌকিতে সে শোয়, আরেকপাশে একটা তোলা উনোনে রান্না করে। রাস্তার পাশে ঘর। পাছে পথচারীরা তাদের ঐশ্বর্য দর্শনে বিচলিত হন, তাই সুতপা পুরনো শাড়ি দিয়ে পর্দা বানিয়েছে। সেই পর্দার ফাঁক দিয়েই সে ছেলেটিকে দেখে আর ভাবে নানান কথা। ভাবতে ভাল লাগে তার। কেন, কে জানে ?

একদিন কি মনে হল সুতপার, হাতছানি দিয়ে ছেলেটিকে কাছে ডাকল। ভেবেছিল, সে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য ! ছেলেটি নির্ভয়ে এগিয়ে এল তার কাছে। চোখদুটিকে বড় বড় করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি ? কেন ডেকেছ ?"

ওর সপ্রতিভ আচরণে সুতপা একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। কিন্তু ডাক যখন দিয়েছে, তখন আর চুপ করে থাকা সাজে না। তাছাড়া সুতপা কত দিন কত কথা ভেবেছে ওর সম্পর্কে। ভেবেছে ওর সঙ্গে কথা কইবে, ওকে কোলে নেবে, আদর করবে। সেই সুযোগ আজ এসেছে। হেসে সুতপা জিজ্ঞেস করে, "তোমার নাম কি ?"

"বাবা ডাকেন বাবলু। ভাল নাম, শ্রীসুপ্রিয় রায়!"

ভারী মিষ্টি গলা ছেলেটির। সুতপার বড় ভাল লাগে। সহসা সে দুহাতে তাকে কোলে তুলে নেয়। বুকে চেপে ধরে। একটা অভূতপূর্ব শিহরণ সঞ্চারিত হয় তার দেহে ও মনে। আনন্দে ও আবেশে সে কথা বলতে পারে না। কেবল প্রাণভরে বাবলুকে আদর করে। বাবলুও চুপ করে থাকে। সুতপার সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করে। কিছুক্ষণ কেটে যায়। তারপর বাবলুর খেয়াল হয়, "আমাকে নামিয়ে দাও। দোকানে যাব। বাবার সিগারেট নিয়ে যেতে হবে। দেরি হয়ে গেছে।"

সুতপা তবু তাকে নামিয়ে দেয় না। বলে, "বাবা তোমাকে কেন দোকানে পাঠান? নিজে আসতে পারেন না?"

"না।"

"কেন?"

"বাঃ! বাবাকে বুঝি কাগজ পড়তে হবে না?"

"তোমাদের বাড়িতে কি আর কেউ নেই?"

"আছে, পাঁচুদা আর ভোলা।"

"তারা কি করে?"

"পাঁচুদার তো কত কাজ। দুধ আনে, জল তোলে, বাসন মাজে, রান্না করে।"

"ভোলা? ভোলা কি করে?"

"ঘুমোয়। তাকে রাত জেগে পাহারা দিতে হয় কি না?"

"একটু কম ঘুমিয়ে দোকান থেকে সিগারেট নিয়ে গেলেই তো পারে।"

বাবলু খিলখিল করে হেসে ওঠে। সুতপা অবাক হয়। একটু বাদে হাসি থামিয়ে বাবলু গম্ভীর গলায় বলে, "তুমি বড্ড

বোকা। ভোলা কি সিগারেট কিনতে পারে? ভোলা তো আমাদের কুকুর!"

সুতপাও হেসে ফেলে। মনে মনে ভাবে বাবলু সত্যই তাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বাবলুর বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সে খুশী হয়। তার বাবা-মা-র সৌভাগ্যে ঈর্ষা হয় সুতপার।

একটি বছর কেটে গেছে। জগতের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এ পাড়াও অপরিবর্তিত থাকে নি। নতুন বাড়ি হয়েছে, নতুন দোকান হয়েছে, নতুন নতুন লোক এসেছে। বাবলুও বড় হয়েছে। সে এখন স্কুলে পড়ে। রোজ সকালে বইয়ের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে স্কুলে যায়। সুতপা কিন্তু তেমনি রয়েছে। তবে সে এখন আরও সকালে ঘুম থেকে ওঠে। উনোনে আঁচ দিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি হালুয়া বা পরোটা ও আলুভাজা ভাজতে হয়। বাবলু কেবল এক কাপ দুধ আর দুখানি বিস্কুট খেয়ে আসে বাড়ি থেকে। অত সকালে নাকি ওকে টিফিন বানিয়ে দিতে পারে না। তবে ওর বাবা একটি করে সিকি দেন টিফিন খেতে। আচ্ছা লোক, এতটুকু ছেলে, কি না কি খাবে, তার কি কোন ঠিক আছে? হয়তো আচার কিনবে অথবা ঘুগনি কিংবা ফুচকা। ব্যাস্, খেলেই অসুখ। সুতপা তাকে বারণ করে দিয়েছে কিছু কিনে খেতে। কিন্তু পাছে দুষ্টু ছেলেদের পাল্লায় পড়ে তার বারণ না শোনে, তাই বাবলুর হাত থেকে সে রোজ সিকিটা নিয়ে নেয়। ওর ইচ্ছে, এই সিকি জমিয়ে বাবলুকে সাইকেল কিনে দেবে। অথচ এক কাপ দুধ আর দুখানি বিস্কুট খেয়ে কেউ কি বেলা দশটা অবধি থাকতে পারে? তাই সুতপাকে অত সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয়। বাবলুকে টিফিন বানিয়ে দিতে হয়।

টিফিনের কৌটো নিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে সুতপা।

বাবলু দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়েই 'মাসি' বলে ছুটে আসে। সুতপা ভয় পায়। সাবধান করে, "দেখিস, পড়ে যাসনে যেন।"

কিন্তু সে সাবধান-বাণীতে বাবলুর গতিবেগ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না। সে তেমনি বেগেই ছুটে এসে দু-হাতে মাসিকে জড়িয়ে ধরে। সুতপা তাকে কোলে তুলে নেয়, তার মাথায় হাত বুলায়, চুমু খায়। বাবলু চুপ করে থাকে। হঠাৎ খেয়াল হয় সুতপার। তাড়াতাড়ি কোল থেকে নামিয়ে দেয় তাকে। বলে, "এই রে, তোর বোধ হয় স্কুলের দেরি হয়ে গেল।" টিফিনের কৌটোটা বাবলুর ব্যাগে ভরে দেয় সে। তার পরে বলে, "খবরদার কারও সঙ্গে ঝগড়া করবি না। মন দিয়ে লেখাপড়া করবি আর আন্টির কথা শুনবি।"

"আচ্ছা।" সুবোধ বালকের মত ঘাড় নাড়ে বাবলু। এগিয়ে চলে স্কুলের পথে। খানিকটা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, ফিরে তাকায়, একটু হাসে। তারপরে হঠাৎ ছুট লাগায়। সুতপা মৃদু হেসে আপন মনে বলে উঠে—দুষ্টু কোথাকার!

স্কুল থেকে ফেরার পথে বাবলু আবার আসে। মাসি বলে ডাকতে ডাকতে ভেতরে ঢোকে। ব্যাগটা নামিয়ে, টিফিনের কৌটোটা বের করে সুতপার হাতে দেয়। সুতপা তখন সংসারের কাজে ব্যস্ত। কৌটোটা পাশে রেখে কাজ করতে করতেই বলে, "খাটের ওপর গিয়ে বোস্।"

শান্ত ছেলের মত বাবলু গিয়ে খাটে বসে। পা দোলাতে দোলাতে বলে, "জানো মাসি, আজ না"...সুতপা ওর দিকে তাকায়। বাবলু বলে, "আন্টি আমাকে দুটো গুড্ আর একটা ফেয়ার দিয়েছে।"

"সেটা গুড্ হল না কেন?" সুতপা গম্ভীর।

বাবলু ঘাবড়ে যায়। আপনা থেকেই তার পা দোলানো বন্ধ

হয়, ভয়ে ভয়ে জবাব দেয়, "একটা অঙ্কের ফল লিখতে ভুল করেছিলাম।"

সুতপা কোন জবাব দেয় না। নিজের কাজ করে যেতে থাকে। বাবলু করুণচোখে তার দিকে তাকায়। সুতপা তবু নির্বাক। বাবলু খাট থেকে নেমে এসে সুতপার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। কোনমতে বলে, "আর ভুল করব না মাসি। এবারটি মাপ করে দাও।" ওর দুচোখ জলে ভরে ওঠে।

সুতপা আর গম্ভীর থাকতে পারে না। তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে আঁচলে মুছে, বাবলুকে কাছে টেনে নেয়, "করো না বাবা, ভুল করো না। তোমাকে কত লেখাপড়া শিখতে হবে। উড়োজাহাজে চেপে বিলেত যেতে হবে।"

এমনি করে কেটে যায় দিন, চলে যায় মাস, গত হয় আরও একটি বছর। এই এক বছরে বাবলু বড় হয়েছে, সুন্দর হয়েছে। কিন্তু তাকে সে কথা বলার জো নেই। বললেই উলটো সে সুতপাকে শুনিয়ে দেয়, "তুমিও খুব সুন্দর মাসি।"

"তুই যে আমার থেকেও সুন্দর।"

"ধ্যেৎ, তুমি কত বড়, কত সুন্দর।"

"বেশ তুই বড় হ। আমি আমার মত সুন্দর একটা বৌ এনে দেব তোকে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।" সুতপা অতি কষ্টে হাসি চাপে।

"সে তোমার মত আমাকে ভালবাসবে?"

"হ্যা রে, আমার থেকেও অনেক বেশি ভালবাসবে।"

"তাহলে এখুনি তাকে এনে দাও না মাসি।"

সুতপা আর হাসি সামলাতে পারে না। তাকে হাসতে দেখে বাবলু একটু বিরক্ত হয়, কিন্তু তার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে না। সে

বলে চলে, "তুমি তো আমাদের বাড়ি যেতে চাও না মাসি। বৌকে কিন্তু আমি বাড়ি নিয়ে যাব।"

সুতপা হাসতে থাকে। এবারে বাবলু রেগে যায়, "এরকম করলে আমি কিন্তু চলে যাব মাসি। আর আসব না তোমার কাছে।"

"না এসে থাকতে পারবি?'

"খুব পারব। তুমি দেখে নিও মাসি।" বাবলু উঠে দাঁড়াতে চায়।

সুতপা তাকে কাছে টেনে নেয়, "তোর তা পেরে কাজ নেই বাবা। তুই না এলে যে আমি বাঁচব না।"

কিছুক্ষণ পরে বাবলু বিদায় নেয়। সুতপা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ে। বাবলু আস্তে আস্তে দূরে চলে যায়। সুতপা ভাবে —এ কি বিচিত্র মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ল সে! চিরকাল সুতপা এখানে থাকবে না। বাবা তার বিয়ের চেষ্টা করছেন। একদিন তাকে বিদায় নিতে হবে এ বাড়ি থেকে, এ পাড়া থেকে। তখন যে দুঃসহ দুঃখ সইতে হবে তাকে। পরের ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে, এ দুঃখ সে ডেকে আনল কেন? কেনই বা তার মনে এই স্নেহ-প্রস্রবণের সৃষ্টি হল? কেন? কেন? কেন?

কেন? কেন? কেন? শতসহস্র প্রশ্ন আকুল করে তোলে সুতপাকে। সেদিন বাবলু বলেছিল—আর আসব না তোমার কাছে।...তুমি দেখে নিও মাসি। কিন্তু তার পরে তো সে হাসি মুখেই বিদায় নিয়েছে। অথচ আজ তিন দিন হয়ে গেল বাবলু আসে না তার কাছে। আর এই তিন দিন.....? অহোরাত্র ছটফট করেছে সুতপা। কেবলই ভাবছে, কেন সে আসছে না? কেন? কেন? কেন?

উত্তর মেলে নি। চিন্তাই সার হয়েছে। অবশেষে নিরুপায় হয়ে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে—ইস্, কি নির্বোধ সে! বাবলু আজ দু বছর হল তার কাছে যাওয়া-আসা করে। অথচ কোনদিন তাকে বাড়ির ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করে নি। এমন কি তার বই-খাতা থেকেও দেখে রাখে নি। বাবলুর যে একটা আলাদা ঠিকানা আছে, তাই তার কোনদিন খেয়াল হয় নি। ভেবেছে সে তো আসবেই, সে যে সুতপার।

কিন্তু বাবলু হারিয়ে গেলে তো সুতপা বাঁচবে না। তাড়াতাড়ি শাড়িটা পাল্টে নেয় সে। এই অসময়ে মা তাকে বেশ পরিবর্তন করতে দেখে বিস্মিত হন। জিজ্ঞেস করেন, "কোথায় যাচ্ছিস?"

"বাবলুকে খুঁজতে।"

"ঠিকানা জানিস না···কোথায় খুঁজবি? কলকাতা শহর।"

"সে নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোন বাড়িতে থাকে। আমি দেখেছি ওই গলির মুখে গিয়ে বাঁ দিকে বেঁকে যায়। একটু খুঁজলেই পেয়ে যাব।"

"আচ্ছা যা। কিন্তু বেশি দেরি করিসনে যেন।"

"না মা। বাবা বাড়ি আসার আগেই ফিরে আসব।" সুতপা বেরিয়ে আসে বাইরে। সে এগিয়ে চলে বাবলুর পথে। গলির মুখে এসে থমকে দাঁড়ায়। বাঁ দিকে মোড় ফেরে। কিন্তু তারপর? সুতপার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। বাড়ির পরে বাড়ি! প্রতি বাড়িতে কত শত লোক। এই জনারণ্যের মাঝে সে কেমন করে খুঁজে পাবে তার ছোট্ট বাবলুকে। কিন্তু পেতে যে তাকে হবেই। যেমন করেই হোক। প্রতি বাড়িতে, প্রতি ঘরে গিয়ে খুঁজতে হবে তাকে। তাই করতে থাকে সুতপা। প্রতি বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়ে আর জিজ্ঞেস করে, "এই বাড়িতে বাবলু বলে কেউ থাকে?"

কেউ বা 'না' বলে দরজা বন্ধ করে দেয়, কেউ বা শুধু চেয়ে থাকে তার দিকে। নতমস্তকে সুতপা বেরিয়ে আসে পথে।

কয়েকটি ছেলে রাস্তায় খেলা করছে। সুতপা তাদের কাছে এসে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, "তোমরা কেউ বাবলুকে চেন? বাবলু···ঐ ওপাড়ার স্কুলে পড়ে। খুব সুন্দর দেখতে।"

ছেলেরা খেলা থামায়। সবচেয়ে বড় ছেলেটি সুতপাকে প্রশ্ন করে, "কোন্ বাড়িতে থাকে বলুন তো?"

হায় ভগবান! তাই যদি জানবে, তাহলে কেন সে তাদের কাছে এসেছে? বলে, "বাড়িটা ঠিক চিনি না।"

"আচ্ছা, তার বাবার নাম কি?"

সুতপা আরো বিব্রত হয়ে পড়ে। তবু কোনমতে উত্তর দেয়, "পুরোনামটা জানি না। তবে ওরা রায়।"

"আচ্ছা, তিনি দেখতে কেমন?"

সুতপা চুপ করে থাকে। ছেলেটি ভারিক্কি চালে বলে, "তাও জানেন না? কিছুই যখন জানেন না, তখন বাড়ি ফিরে যান।"

সুতপা নিঃশব্দে এগিয়ে চলে। পথের দুধারের বাড়িগুলোর দিকে নজর দিতে দিতে অগ্রসর হতে থাকে। এখনও সে নিরাশ হয় নি। হয়তো কোন বাড়ির জানালায় দেখবে তার বাবলু দাঁড়িয়ে আছে। সুতপাকে দেখতে পেয়েই সে 'মাসি' বলে ছুটে আসবে কাছে। তার বুকে মুখ লুকিয়ে বলবে—তুমি এসে গেছ মাসি, আমি তোমার জন্যে কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

কিন্তু কোথায় বাবলু? কত ছোট ছোট ছেলেকে দেখছে সে। আর যাকে দেখার আশায় পাগলের মত পথে পথে ঘুরছে সুতপা, সে নেই।

"এ-সব কি ভাবছে সে? বাবলু আছে নিশ্চয়ই আছে। হয়তো সুতপার ভুল হয়েছে—বাবলু এ পাড়ায় থাকে না। সে থমকে

দাঁড়ায়, উল্টো দিকে চলতে শুরু করে। আর ঠিক তখনই শব্দটা তার কানে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে ওঠে, "বাবলু, বাবলু।" ছুটে যায় জানালাটার কাছে। আবার ডাকে, "বাবলু, বাবলু।" ভেতর থেকে একটা কুকুর ডেকে ওঠে, ঘেউ ঘেউ।

"বাবা, ঐ যে মাসি আমাকে ডাকছে। আমি মাসির কাছে যাব—আমার মাসি।"

না, ভুল করে নি সুতপা। খাটে বাবলু শুয়ে আছে। অল্পবয়সী একটি ছেলে বোধহয় চাকর, মাথায় জলপটি দিচ্ছে। একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিল খাটের পাশে। সে পিছন ফিরে তাকায়। সুতপাকে দেখে এগিয়ে আসে জানালার কাছে। বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "কে ?"

"আমি। দরজা খুলুন।" সুতপা ছুটে আসে দরজার কাছে। নেম-প্লেট রয়েছে অনিল রায়। বোধহয় বাবলুর বাবার নাম। সুতপা দরজায় ধাক্কা দেয়। আবার ডাকতে থাকে, "বাবলু বাবলু।"

একটু বাদেই দরজা খোলে অনিল। কুকুরটা তার পেছনে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে। সুতপা তখন উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে। তারই মধ্যে সে অনিলকে ভাল করে দেখে নেয়। বাবলুর মুখশ্রীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। অনিল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, "আপনি এসে গেছেন ! বাঁচালেন আমাকে। আসুন, ভেতরে আসুন।" সে সাগ্রহে তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়।

সুতপা ছুটে আসে পাশের ঘরে। বাবলু, হ্যাঁ, তারই বাবলু শুয়ে আছে খাটে। পাঁচু তখনও তার মাথায় জলপটি দিচ্ছে। কি হয়েছে বাবলুর ? আহা, অমন সুন্দর ছেলের কি চেহারা হয়ে গেছে ! নিশ্চয়ই সেই থেকে ভুগছে। আর সুতপা কত কথাই না ভেবেছে। ভেবেছে—বাবলু আর তার কাছে যাবে না।

ভেবেছে. সে বাবলুকে হারিয়েছে চিরকালের মত। ছিঃ, বাবলু তার, চিরকাল তারই থাকবে।

সুতপা ছুটে আসে বাবলুর শয্যাপাশে। ওর মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে বলতে থাকে, "বাবলু বাবা, আমি এসেছি।"

"কে? মাসি?" বাবলু যেন সংবিৎ ফিরে পায়। সে বড় বড় চোখ মেলে সুতপাকে দেখে। তারপরেই আকুল দু-বাহু বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নেয়। তৃপ্তকণ্ঠে বলে, "মাসি, আমার মাসি, আমার মা···কতদিন তোমাকে দেখি নি।"

"আমি জানতাম না তোর অসুখ হয়েছে।"

"তুমি আর চলে যেও না মাসি।"

"না বাবা, তোকে ফেলে আমি কোথাও যাব না।"

অনিল এতক্ষণ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিল। এবারে এগিয়ে এসে পাঁচুকে বলে, "একটু চা কর। বাবলুর মাসি এসে গেছেন। আর চিন্তা নেই। এবারে বাবলু ভাল হয়ে যাবে।"

সুতপা একটু লজ্জা পায়। তবু বলে, "তাই যদি জানেন, তাহলে তো আরও আগেই ওকে ভাল করে তুলতে পারতেন।"

"কেমন করে? আমি তো আপনার ঠিকানা জানি না।" অনিল বিস্মিত।

"ওর কাছ থেকে বাড়িটা জেনে নিয়ে আমাকে একটা খবর দিলেই তো পারতেন।"

লজ্জিত কণ্ঠে অনিল বলে "ঠিক, খেয়াল হয় নি।"

"আপনার না হয় হয় নি, কিন্তু ওর মা-র?"

"না। তারও খেয়াল হয় নি। কারণ ··"অনিল একবার থামে। তারপরে ভারী স্বরে বলে, "তিন বছর হল সে পার্থিব খেয়ালের ঊর্ধ্বে উঠে গেছে।"

"অ্যা ? বাবলুর মা নেই !" সুতপা আর কিছু বলতে পারে না। অনিলও চুপ করে থাকে।

নীরব কিছুক্ষণ। তারপরে বাবলু সে নীরবতা ভঙ্গ করে। ক্ষীণ কণ্ঠে সুতপাকে বলে, "আমার মা সগ্‌গে চলে গেছে মাসি। জান, মা সেখান থেকে সব সময় আমাকে দেখে। তাই তো আমি দুষ্টুমি করি না, মন দিয়ে পড়াশুনা করি আর ভাল হয়ে থাকি। নইলে মা যে কষ্ট পাবে মাসি।"

"হ্যাঁ বাবা। তুমি ভাল হলে, বড় হলে তিনি শান্তি পাবেন।" সুতপার দু চোখ জলে ভরে ওঠে। অনিল নির্বাক, আর বাবলু? একবার সুতপার দিকে আর একবার বাবার দিকে তাকায়। তারপরেই হঠাৎ কেঁদে ওঠে। সুতপা তাকে কাছে টেনে নেয়।

একটু বাদে পাঁচু চা নিয়ে আসে। তার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে সুতপার দিকে এগিয়ে দেয় অনিল। তারপরে বাবলুকে বলে, "কাঁদছিস কেন ? মা যে তোর অনেকদিনই নেই। তার অভাব তো তোর সয়ে গেছে। মাসির জন্যে এ ক'দিন কান্নাকাটি করছিলি। এই তো মাসি এসে গেছেন।"

সুতপা নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দেয়। তারপরেই খেয়াল হয়। অনিলকে জিজ্ঞেস করে, "আপনি চা খেলেন না ?"

"না। ক'দিন বড়ই অনিয়ম চলেছে। আজ তাই বমি বমি করছে। এখন আর চা খাব না।"

সুতপা আর কিছু বলে না। আপন মনে এই অসহায় মানুষটির কথা ভাবতে থাকে। বাবলুর মা নেই, তবে বাবা আছেন। কিন্তু ওর ? ওর যে কেউ নেই। সহানুভূতিতে তার মন ভরে ওঠে। কিন্তু সে কি করতে পারে ?

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে সুতপা উঠে দাঁড়ায়। কাপটা পাঁচুকে ফিরিয়ে দিয়ে বাবলুর পরিচর্যায় লেগে যায়। অনিলকে বলে,

"আপনি বাবলুকে কোলে নিয়ে একটু বসুন। আমি বিছানাটা ঠিক করে দিচ্ছি।"

"আপনি আবার কষ্ট করছেন কেন ? সে আমি করে নেব'খন।"

সুতপা গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দেয়, "যা বলছি তাই করুন।"

অনিল নিঃশব্দে তার নির্দেশ পালন করে। সুতপা বিছানা ঠিক করে বাবলুর জামা-প্যাণ্ট পালটে দেয়। তারপরে ঘর-দোর পরিষ্কার করতে লেগে যায়। পাঁচু তাকে সাহায্য করতে এসে ধমক খায়।

কিছুক্ষণ বাদে ডাক্তারবাবু আসেন। তিনি রোগী দেখে খুশি হন।

অনিল হেসে বলে, "দু ঘণ্টা আগেও কিন্তু আপনার রোগীর এমন অবস্থা ছিল না ডাক্তারবাবু।"

"সে আমি জানি মিস্টার রায়।" তিনি সুতপার দিকে তাকান। সুতপা মাথা নিচু করে। ডাক্তারবাবু বলেন, "আমি তো কালও বলে গেছি মিস্টার রায়, আপনি ওর মাসিকে খুঁজে নিয়ে আসুন।"

"খুঁজতে হয় নি নিজেই এসেছেন।"

"খুবই স্বাভাবিক। প্রয়োজনে পর্বত মহম্মদের কাছে যায়। তবে এই স্বার্থ-সর্বস্ব যুগে এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা বড় একটা দেখা যায় না, এই যা।"

"কিন্তু কখনও কখনও বাস্তব যে কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়—এটা তো মিথ্যে নয় ডাক্তারবাবু।"

"হ্যাঁ, তাই দেখতে পাচ্ছি।" হেসে বিদায় নেন ডাক্তার।

অনিল তাঁকে এগিয়ে দেয় দোর অবধি। ফিরে এসে সুতপাকে বলে, "কি, বাড়ি-টাড়ি যাবেন ?" সে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। হয়তো সুতপার সঙ্গে বয়সের পার্থক্যই তাকে স্বাভাবিক হতে সাহায্য করেছে।

কিন্তু সুতপা ? না, তার আড়ষ্টতা এখনও কাটে নি। সে কোনমতে ঢোঁক গিলে বলে, "হ্যাঁ, এখন যাব।"

"এখুনি চলে যাচ্ছ মাসি ?"

"হ্যাঁরে, সন্ধ্যে হয়ে এল। কাল আবার আসব।"

"ঠিক বলছ তো ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসব। তোর অসুখ হয়েছে জেনেও কি আমি না এসে পারি।"

"তাহলে এতদিন আস নি কেন ?"

"আমি যে জানতাম না তোর অসুখ হয়েছে। তোদের বাড়িও চিনতাম না।"

"কেন ? বাবা তোমাকে খবর দেয় নি ?" বাবলু অনিলের দিকে তাকায়, "তবে তুমি যে সেদিন বললে বাবা, মাসিকে খবর দিয়েছ। মাসি বলেছে—পরে আসবে।"

অনিল চুপ করে থাকে। সুতপা ক্রুদ্ধ নেত্রে তার দিকে তাকায়, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, "ছিঃ ছিঃ! নিজে সাহস করে যেতে পারেন নি। অথচ অসুস্থ ছেলেটাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিতে মুখে আটকায় নি।"

ঢোঁক গিলে জবাব দেয় অনিল, "ঠিক সাহসের অভাবে নয়। ভেবেছি..."

"ভেবেছেন, কোথাকার কে না কে, তাকে আবার খবর দিয়ে কি হবে ?"

"না না। তা নয়। মানে..."

"থাক থাক, একটা মিথ্যে ঢাকতে পঞ্চাশটা মিথ্যে বলতে হবে না। দয়া করে কাল আমি আসা পর্যন্ত ছেলেটাকে একটু দেখবেন।" সুতপার কণ্ঠস্বর অপরিবর্তিত। একটু থেমে বাবলুকে বিদায় জানায় সুতপা। তারপর ত্রস্ত পায়ে দরজার দিকে এগোয়।

অনিল পেছন পেছন আসে। বাইরে বেরিয়ে বলে, "সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আমি সঙ্গে আসব কি?"

"না। একা যখন আসতে পেরেছি, একাই যেতে পারব।" তাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সুতপা এগিয়ে যায়। অনিল কিছুক্ষণ সুতপার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ঘরে ফিরে আসে।

পরদিন দুপুরে সুতপা আবার আসে। একা নয়, মাকে সঙ্গে নিয়ে। কড়া নাড়তেই পাঁচু এসে দরজা খুলে দেয়। ভোলা যথারীতি তার পেছনে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে। ওরা ভেতরে ঢোকে। সুতপাকে দেখতে পেয়েই বাবলু হাসে। খুশিতে তার মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সুতপা একবার চারিদিকে তাকায়। না, অনিল নেই। ডাক্তারবাবুর কাছে গেছে। কিন্তু তিনি তো কাল বলেই গেলেন যে আজ বিকেলে আসবেন।

"মাসি আমার কাছে এসো।" বাবলু ডাক দেয়।

সুতপা তার কাছে এসে বসে। বাবলু সুতপার মাকে দেখতে পেয়ে বলে ওঠে, "দিদিমা, তুমিও এসেছ? কি মজা, মাসি এসেছে, দিদিমা এসেছে। দাদু? দাদু আসে নি মাসি?"

"না, বাবা তো এখন অফিসে।"

"আমার বাবাও অফিস গেছেন।"

"অফিসে?" সুতপা বিস্মিত। তবে কি তার কালকের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে এড়াবার জন্যেই সে গা-ঢাকা দিয়েছে? কিন্তু তার ওপর রাগ করে অসুস্থ ছেলেটাকে একা ফেলে নিজে অফিসে গেছে? ছেলের চেয়ে চাকরি বড় হল? আর যদি সুতপাকে এড়ানোই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তো তার পালাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতপাকে আসতে মানা করে দিলেই পারত। কি মনে করেছে সে? সুতপা কি এ বাড়িতে না এসে

পারে না? একবার ভেবেও দেখে নি, বাবলুর প্রতি স্থতপার স্নেহ স্বার্থহীন। কি জানি কি ভেবেছে। পুরুষমানুষকে বিশ্বাস নেই।

বাবলু নানা প্রশ্নে তাকে আকুল করে তুলতে চায়। কিন্তু উতলা স্থতপা আজ আর কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারে না। তার অস্থিরতা বাড়তে থাকে। একসময় হঠাৎ বলে ওঠে, "বাবলু আজ আর বসব না। এখন চলি। বাবাকে বোলো কাল অফিসে যাবার দরকার নেই, আমি কাল আসব না।"

"আসবে না?" বাবলু যেন আঁতকে ওঠে।

"না।"

"তাহলে আজ আর একটু বোসো।" বাবলু করুণ স্বরে বলে।

"না রে, বাড়িতে কাজ আছে।" স্থতপা উঠে দাঁড়ায়।

"কি কাজ? তোর বাবা তো আসবেন সেই সন্ধ্যের পর।" মা প্রতিবাদ করেন।

"না মা। আর এখানে নয়।"

মা মেয়েকে চেনেন। কাজেই আর কথা বাড়াতে চান না। বাবলুর দিকে একবার তাকিয়ে তিনিও উঠে দাঁড়ান। বাবলু আবার বলে, "এই তো এলে, আর একটু বোসো না মাসি।"

স্থতপার দুচোখ জলে ভরে উঠতে চায়। তবু সে কঠিন হয়। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় না। যথাসম্ভব স্বাভাবিক স্বরে বলে, "ঐ তো পাঁচু রয়েছে। তোমার বাবাও এসে যাবেন অফিসের পরে।"

"তাহলে কাল এসো।" বাবলু সবিনয়ে বলে। স্থতপা চুপ করে থাকে।

বাবলু আবার বলে, "আসবে তো মাসি?"

স্থতপা তবু নির্বাক।

মা তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আসবে বই কি। আমরা আবার আসব দাদুভাই।"

"এসো দিদিমা। মাসিকে নিয়ে এসো। মাসিকে না দেখতে পেলে আমার বড্ড কষ্ট হয়।" বাবলু কেঁদে ফেলে।

তবু মেয়ের পেছনে মাকে বেরিয়ে আসতে হয় ঘর থেকে। বাবলুর কান্নার শব্দকে ছাপিয়ে দরজা খোলার শব্দ হয়। বাবলু উঠে বসে বিছানায়। পর্দার ফাঁক দিয়ে মাসিকে আর একবার দেখতে চায়। কিন্তু সুতপা ততক্ষণে রাস্তায় নেমে এসেছে।

তখনও ভাল করে ভোরের আলো ফোটে নি, পাখিদের কলকাকলী শুরু হয় নি, জীবন-সংগ্রামে বিপর্যস্ত মানুষ সুখশয্যা পরিত্যাগ করে নি। সুতপাও শুয়ে আছে, কিন্তু সুখশয্যায় নয়। সারারাত সে ঘুমোতে পারে নি। তবু শুয়ে আছে। ভাবছে কি হবে এত সকালে উঠে? বাবলুর টিফিন করে দেবার তাড়া নেই। হয়তো সে কাজ তার চিরদিনের মত চুকে গেছে। তবু বাবলুর কথাই ভেবেছে সুতপা—সারারাত ধরেই ভেবেছে। কোন কূলকিনারা পায় নি। আচ্ছা, ভাল হয়ে বাবলু কি কোন দিন আসবে তার কাছে? কেন আসবে না? সে তো তাকে কাছেই রাখতে চায়। সুতপাই দূরে সরে এসেছে। তার মা-বাবা এজন্যে তাকে তিরস্কার করেছেন। তবু সে অবিচলিত রয়েছে। এই দায়িত্ব-জ্ঞানহীন লোকটাকে কিছুতেই সে ক্ষমা করতে পারে নি। অসুস্থ ছেলেকে একা রেখে যে লোক অফিসে যেতে পারে, তাকে কেমন করে ক্ষমা করবে সুতপা? তাই সে চলে এসেছে ওবাড়ি থেকে। তাই সে বাবলুকে দেখতে যাবে না। গেলে যদি দেখা হয়ে যায় তার সঙ্গে, কথা বলতে হয়? না না, সে বরং বাবলুকে হারাবে, তবু—

সুতপার চিন্তায় ছেদ পড়ে। দরজায় কড়া নাড়ছে কেউ। এত সকালে কে এল? আবার শব্দ হয়। সে উঠে বসে। খাট

থেকে নামে। অবিন্যস্ত শাড়িটাকে যথাসম্ভব সুবিন্যস্ত করে নেয়। তারপর দরজার খিল খোলে।

"এ বাড়িতে সুতপা দেবী বলে…"

"আপনি এ সময়ে!" অনিলকে দেখে সুতপা বিস্মিত, "বাবলু কেমন আছে?" সে উৎকণ্ঠিতা।

অনিল জবাব দেয় না।

সুতপা প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, "কথা বলছেন না কেন? বাবলু কেমন আছে?"

"বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছে। কেবলই বলছে—মাসিকে নিয়ে এসো।"

এবারে সুতপা নির্বাক। কি বলবে, কি করবে?

অনিল আবার বলে, "সে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ডাক্তার বাবু আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। আপনি না গেলে নাকি শত চিকিৎসা করেও তাকে ভাল করে তোলা যাবে না। আপনি চলুন।"

"কিন্তু" সুতপা শেষ করতে পারে না। অনিল করুণ নয়নে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে কি তাকে ফিরিয়ে দেবে? তাহলে যে বাবলু…, "আচ্ছা, আপনি একটু বসুন। আমি মা-বাবার সঙ্গে কথা বলে নিই।"

অনিল সুতপার বিছানায় বসে। সুতপা পাশের ঘরের দোরগোড়ায় গিয়ে মাকে ডাকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মা এ-ঘরে আসেন। তাঁর পেছনে বাবাও। অনিল উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত জোড় করে তাঁদের নমস্কার করে। সব শুনে বাবা বললেন, "যাবে বই কি, নিশ্চয়ই যাবে। আমিও যাব দাদুভাইকে দেখতে।"

"কিন্তু এখন আমি যাই কেমন করে বাবা?" সুতপা মৃদু প্রতিবাদ করে।

"কেন অসুবিধেটা কিসের ?" বাবা সুতপাকে প্রশ্ন করেন।

"তোমার অফিস আছে। রান্না করতে হবে যে।"

"কেন, তোর মা কি রান্না-টান্না ভুলে গেছে ? একটা দিনও চালাতে পারবে না ? না পারে, উপোস করব। তুই তৈরি হয়ে নে।"

"সাত সকালেই শুরু করলে ? আমি একবারও বলেছি যে রান্না করতে পারব না ?"

"ওঃ তাহলে তো সমস্যা মিটেই গেল। তুমি বরং একটু চায়ের জল চাপিয়ে দাও।" বাবা সন্ধি করেন, "আমরা একটু গলা ভিজিয়েই রওনা হই। কি বলেন মিস্টার রায় ?"

"আজ্ঞে, চা তো আমার ওখানে গিয়েই···"

"হ্যাঁ, খাবো বই কি। তবে বাড়িরটাই বা ছাড়ি কেন ?"

অনিল আর গম্ভীর থাকতে পারে না ! সুতপাও তার সঙ্গে হাসতে থাকে, কাল বাবলুর কাছ থেকে চলে আসার পরে মা সুতপাকে হাসতে দেখেন নি। মেয়ের পরিবর্তন দেখে মা মনে মনে খুশি হয়ে ওঠেন।

বাবলু ভাল হয়েছে। অনিল ভাল হয়েছে, সুতপাও ভাল হয়েছে। সবাই ভাল, সব ভাল। মাঝে মাঝে সুতপার শুধু মনে হয়—কি ভুলটাই সেদিন সে করেছিল। সব না জেনে অনিলকে অযথা দোষ দিয়েছিল, তার ওপর অবিচার করেছিল।

কিন্তু সে কথা সুতপা বলতে পারে নি অনিলকে। যতবার বলতে চেয়েছে, ততবারই এক একটা বাধা এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ না-বলা সেই কথার জন্য সুতপার অস্বস্তির শেষ নেই।

আজ তাই সে ঠিক করে রেখেছে, যেমন করেই হোক, কথাটা বলে ফেলবে তাকে। সে অনিলের ফিরে আসার প্রতীক্ষায়

থাকে। এ প্রতীক্ষা কিন্তু নতুন নয়। এ প্রতীক্ষা শুরু হয়েছে বাবলু ভাল হবার পর থেকে। এই দু'মাসের অধিকাংশ দিনই সুতপা এমনি প্রতীক্ষারতা রয়েছে। বাবলু আজকাল স্কুল থেকে আর বাড়ি যায় না। সুতপাদের বাড়িতেই থাকে। স্নান-খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে নেয়। বিকেলে সুতপা তাকে নিয়ে ও-বাড়িতে যায়। অনিল ফিরে আসে অফিস থেকে। ওরা একসঙ্গে জলখাবার খায়। কোনদিন বাবা এসে সুতপাকে বাড়ি নিয়ে যান, কোনদিন বা অনিল তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। পাশাপাশি পথ চলে ওরা। পথে কত কথা হয়—সবই বাবলুকে কেন্দ্র করে।

সেদিন সহসা অনিল প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেছিল, "ভেবে অবাক হয়ে যাই, এ কেমন করে সম্ভব হল ?"

"কী ?"

"এই যে আপনি আর বাবলু। কোথায় ছিলেন আপনি, আর কোথায় ছিল সে ?" অনিল একবার থেমেছিল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বলেছিল, "কিন্তু একটা কথা ভেবে চিন্তিত না হয়ে পারি না। চিরকাল তো আপনি বাবলুকে কাছে রাখতে পারবেন না। তখন কি হবে, ভেবে দেখেছেন কি ?"

প্রশ্নটা যে সুতপার মনে হয় নি, তা নয়। কিন্তু যে সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না, সে সমস্যাকে ভুলে থাকাই ভাল। তাই সে জবাব দিয়েছে "তার চেয়েও বড় একটা ভাবনা কিন্তু আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।"

"কি বলুন দেখি ?"

"আর কতদিন আমাকে 'এমনি আপনি, আজ্ঞে' চালিয়ে যাবেন ?"

অনিল হোহো করে হেসে উঠেছিল। একটু বাদে হাসি থামিয়ে বলেছিল, "অনুমতি দিলেই সম্ভাষণ পরিবর্তন করিতে পারি।"

"বেশ, দিলাম।"

এবারে কিন্তু অনিলই চুপ করেছিল। সুতপাই হেসে উঠেছে। বলেছে, "কি চুপ করে আছেন কেন? বলুন—সুতপা…তুমি।"

"না।"

"তবে?"

"শুধু তপা। আপত্তি আছে?"

"না।"

সেই থেকে নতুন সম্ভাষণ শুরু হয়েছে। ওরা আরও কাছাকাছি এসেছে। কিন্তু সুতপা টের পায় নি যে অনিল তাকে গোপনে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে।

আজ তাই কড়া-নাড়ার শব্দ পেয়ে সুতপা নিজেই এসে দরজা খুলে দেয়। অনিল জিজ্ঞেস করে, "বাবলু কোথায়?"

"পড়ছে।"

"পাঁচুকে দরজা খুলতে বললেই পারতে।"

"আমার একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে। তাই নিজে এলাম এ ঘরে।"

"কথাটা গোপনীয় বুঝি?" অনিল মৃদু হাসে।

"হ্যাঁ।"

"বেশ, বল।" সে একখানি সোফায় বসে। ইশারায় সুতপাকেও বসতে বলে। কিন্তু সুতপা দাঁড়িয়েই থাকে। কি যেন একটু ভাবে। তারপরে ভারী স্বরে বলে, "আপনি কেন আমাকে বাবলুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন? কেন আমাকে দূর করে দেবার ষড়যন্ত্র করছেন?"

অনিল বুঝতে পারে সুতপা কি বলতে চাইছে। ওর বাবা

সেদিন যখন একটি ছেলে দেখে দেবার অনুরোধ করেছিলেন, তখনই অনিল এ কথা ভেবেছে। কিন্তু বাবলুর জন্য তো সুতপা চিরকাল এমন থাকতে পারে না। যেমন করেই হোক অনিল বাবলুকে সামলাবে। কিন্তু সুতপা সংসারী :হাক, সুখী হোক। তাই সে অনেক হাঁটাহাঁটি করে এই সম্বন্ধটি ঠিক করেছে। ছেলেটি মোটামুটি শিক্ষিত, ভাল চাকরি করে। কোন দাবি-দাওয়া নেই। অনিলের পছন্দ হয়েছে। সুতপা সুখী হবে। আগামী রোববার বিকালে পাত্রপক্ষ সুতপাকে আশীর্বাদ করতে আসবে। কিন্তু আজ তাকে এ-রকম অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, এ কথা কল্পনাও করে নি অনিল। তাই সে চট করে সুতপাকে কোন জবাব দিতে পারে না।

"আপনার কি ক্ষতি আমি করেছি? কেন আপনি এমন করে আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন?" সুতপা আবার অভিযোগ করে।

"কিন্তু তুমি তো সারাজীবন এখানে থাকতে পার না।"

"কেন পারি না?"

"এমনি থাকবে? সংসারী হবে না? বিয়ে করবে না?"

"করব বই কি।" সুতপার কণ্ঠস্বর অপরিবর্তিত।

অনিল হাসে, "তাহলেই তো তোমাকে আমাদের থেকে দূরে সরে যেতে হবে।"

"না।" একটু থামে সুতপা। অনিলের চোখে চোখ রেখে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, "আমি যদি আমার বাবলুকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে রাজী না হই? যদি চিরদিন তার কাছে থাকতে চাই?" সুতপা এগিয়ে আসে।

বিস্মিত অনিল সুতপার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মুখে ভাষা যোগায় না।

সুতপা অনিলের পাশে বসে। তার একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে আবার বলে, "কথা বলছ না কেন? বল, তাহলে কি আমাকে তাড়িয়ে দেবে বাড়ি থেকে?"

অনিল দু-হাত বাড়িয়ে সুতপাকে কাছে টেনে নেয়। সুতপা তার বুকে মুখ লুকোয়। সে চুপ করে থাকে। অনিল বলে "আমি চিরদিন তোমাকে বুকে করে রাখব তপা।"

একটা অভূতপূর্ব শিহরণ সঞ্চারিত হয় সুতপার সারাদেহে তার ঠোঁট দুটি কেঁপে ওঠে, চোখ দুটি বুজে আসে। সে আনন্দে ও আবেশে আকুল হয়।

পাশের বাড়িতে সহসা সাঁঝের শাঁখ বেজে ওঠে। এ বাড়িতে ঐ শাঁখ বহুদিন বাজে নি!

সোনার কাঠি

সাণ্টাক্রুজ। পশ্চিম সীমান্তের সিংহদ্বার। শুধু আগমন নয়, নিষ্ক্রমণ। অবতরণ নয় আরোহণ। শেষ নয় শুরু।

হেনরীর বর্তমান জীবনও এখান থেকে শুরু। সেদিনের কথা আজও তার স্পষ্ট মনে আছে। কুয়াশা-ছাওয়া উষা। এই আগ্রা রোড ধরেই ট্যাক্সি এগিয়ে আসছিল। রান্‌ওয়ের ঐ লাল আলোগুলো চোখে পড়তেই এমিলি হেনরীর হাতখানি আরো জোরে আঁকড়ে ধরেছিল। আরেকবার বলেছিল, "নাইবা গেলে অতদূর। এত বড় আমাদের দেশ। তোমার একটা চাকরি জুটবে না? তি···ন বছর, অ···নে···ক দিন। এতদিন আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না।"

তাকে আরো কাছে টেনে নিয়েছিল হেনরী। মাথায় সস্নেহ পরশ বুলিয়ে বলেছিল, "আর যে তা হবার নয়, মিলি! বণ্ড সই করেছি। অ্যাডভান্স নিয়ে খরচ করে ফেলেছি।" একবার থেমেছিল সে। "তিনটে তো বছর। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তোমার হাতে অন্ততঃ হাজার দশেক টাকা জমবে। ফিরে এসে প্যারেলে একটা কাফে খুলবো। তুমি কিচেন ম্যানেজ করবে। আমি ক্যাশ সামলাবো। আর আমাদের কোনো অভাব থাকবে না। ডেভিডকে ভালোভাবে মানুষ করে তুলবো।"

কি যেন বলতে গিয়েও নিরুত্তর রয়েছিল এমিলি।...

ড্রাইভারের ডাকে চমক ভাঙে। ট্যাক্সি এসে এয়ারপোর্টের গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়েছে। ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ে হেনরী।

মালপত্র বুঝিয়ে দেয় কুলিকে। গতবারেও এ কাজটা করেছে এমিলি। ওয়েটিং-হলে ঢোকে হেনরী। একটা সোফার ওপর বসে। মনে পড়ে দশ বছর আগের কথা। সেই স্বপ্নমধুর দিনগুলোর কথা…

হেনরী তখন নিজাম স্টেট রেলওয়েতে কাজ করতো। ঔরঙ্গাবাদের সহকারী স্টেশন-মাস্টার। সেদিন ইলোরা দেখতে গেছে। সবার মতো সেও অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল কৈলাস মন্দিরের দিকে। ভাবছিল প্রায় দেড়হাজার বছর আগে—যখন ছিল না ডিনামাইট আর ক্রেন, বুল্‌ডোজার আর বিদ্যুৎ, তখন কেমন করে তৈরি করল এ মন্দির। শুধু বাহুবল নয়, কী সূক্ষ্ম শিল্পবোধ! শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল সেইসব অজানা শিল্পাচার্যদের, যাঁরা একখানি পাথর থেকে অনিন্দ্যসুন্দর অগণিত মূর্তিময় সুবিশাল মন্দিরটি সৃষ্টি করে গেছেন—পরবর্তীকালের মানব-সভ্যতার সকল গর্বকে খর্ব করতে।

"কী সুন্দর!"

হঠাৎ যেন বীণা বেজে ওঠে। তবে কি মন্দিরগাত্র থেকে বীণাপাণি…?

আত্মবিস্মৃত হেনরী প্রকৃতিস্থ হয়। না। দেবী নয়, মানবী। টানা-টানা দুটি চোখ, কালো কোঁকড়ানো চুল, উদ্ধত বক্ষ, সঙ্কীর্ণ কটিদেশ—আর সেই নির্জন পরিবেশ।

"সত্যিই।" হেনরী কথা বলে।

"আপনারও ভালো লেগেছে না?"

"হ্যাঁ।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু এমিলিকে হেনরীর কৈলাস-মন্দিরের চেয়ে ভালো লাগে। বিদায়বেলায় অজন্তা যাবার আমন্ত্রণ জানায় এমিলি।

পরদিন অজন্তায়। ঢালু পথটি বেয়ে ঝরনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল দুজনে। এতক্ষণ ভিড়ের মধ্যে কথার অভাব হয় নি। জনতার চাপে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়েছে। অন্যমনস্কভাবে হাতে হাত মিলিয়েছে। খেয়াল হতেই ছেড়ে দিয়েছে। অথচ এই নির্জন পরিবেশ একটা লজ্জামধুর নীরবতার প্রলেপ দিল বুলিয়ে। সামনে বিক্ষুব্ধ ঝরনা। পেছনে দেড়হাজার বছর আগের মানব-সভ্যতার স্তব্ধ ইতিহাস।

হেনরীকে ক্যামেরা তুলতে দেখে এমিলি বলে, "ওকি করছেন?"

"আপনার একখানা ছবি নিচ্ছি।"

"কি হবে সে ছবি দিয়ে?"

"যখন আপনি হারিয়ে যাবেন বহুদূরে, তখন আপনাকে দেখবো বসে বসে।"

"তাতে কি মন ভরবে? অজন্তা দেখেও বুঝলেন না ছবির প্রাণ নেই?"

"কিন্তু বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াই কেমন করে?"

"চাঁদ যদি হাতের মুঠোয় ধরা দেয়?" এমিলির কণ্ঠে মাদকতা। হেনরীর দিশেহারা। এমিলির চোখে জল, "তুমি পুরুষ। তোমার পরিধি বিশাল। একদিন আমার ছবি ফেলবে হারিয়ে। আমাকে যাবে ভুলে। কিন্তু আমি⋯?"

পাহাড়ী রোদের শেষ ফালিটুকু গেল মিলিয়ে। অজন্তা আরো একটি দিন পেছনে ফেলে এল। বাঁ-দিকে পাহাড়ের ওপর বাঁধানো জায়গাটায় এখনো আলো রয়েছে। একশ' চল্লিশ বছর আগে একদিন ফার্গুসন ঐখানে দাঁড়িয়ে অজন্তাকে আবিষ্কার করেছিলেন।

"May I have your attention, please।..."

মাথার ওপর লাউড-স্পীকার গর্জে ওঠে। বাহরিনগামী 'বি. ও. এ. সি. কমেট ফোর' কলোম্বো থেকে প্রায় এসে গেছে। কাস্টম্‌স্‌-কর্তৃপক্ষ তল্লাসীর জন্যে যাত্রীদের আহ্বান জানাচ্ছেন।

প্ল্যাষ্টিকের কিট-ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ায় হেনরী। কাস্টম্‌স্‌-এনক্লোজারে এসে ঢোকে। কথায় কথায় আলাপ জমে ওঠে প্রিভেন্টিভ অফিসারের সঙ্গে। তল্লাসী শেষ করে তিনি বলেন, "এখনো এয়ারক্রাফ্‌ট্‌ আসতে প্রায় আধঘণ্টা। হাতেও কোনো কাজ নেই। আসুন একটু গল্প করা যাক। বাহরিনের কথা বলুন।"

ছুজনে একটা সোফায় বসে। হেনরী শুরু করে—"চারদিকে ইংরাজ প্রভাবের মধ্যে বাহরিনের শেখ তবু খানিকটা স্বাধীন। রাজ্যের সীমা চিহ্নিত নয়। তবে আয়তন প্রায় আড়াইশ' বর্গ-মাইল। লোকসংখ্যা সোয়া লক্ষের মতো। অয়েল-কম্প্যানীর নিম্নস্তরের কাজ ছাড়া, মাছ-ধরা, মুক্তা-তোলাই প্রধান উপজীবিকা। পারস্য-উপসাগরের প্রচণ্ড রোদ আর ঢেউকে উপেক্ষা করে ওরা ঢাউয়ে চড়ে মাছ ধরে, শামুক তোলে। ঢাউ মানে নৌকো।"

"হাটবাজার কেমন?" অফিসারের কণ্ঠে কৌতূহল।

"মানামা বাজার হল কেনা-বেচার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। বাজার বলতে রাস্তার খানিকটা অংশ। ফুটপাথ নেই। রাস্তার ছ'ধারে দোকানের সারি। ওপরে চট টাঙানো। রোদ পড়ে না। খদ্দেররা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দরাদরি করে। দোকান দেখে বোঝার উপায় নেই, কী পাওয়া যাবে। মুক্তা থেকে শুরু করে টাইপ-রাইটার ও ট্র্যানজিস্টর অতি সাধারণ দোকানেও পাওয়া যায়। পর্বতপ্রমাণ বোঝা নিয়ে উট ও গাধা পরম নিশ্চিন্তে মানুষের ভিড় ঠেলে চলে। হয়তো ওদের ধাক্কায় দোকানের জিনিসপত্র গেল

উল্টে। দোকানী নির্বিকার। সে মনোযোগ দিয়ে আবার দোকান সাজাতে শুরু করে।

"দেশী হাট দেখতে চমৎকার। চারদিকে তাঁবুর দোকান। কাপড় থেকে শুরু ক'রে খেজুর, ভেড়া-ছাগল, চাষের সরঞ্জাম—সবই প্রায় পাওয়া যায়। পুরোদমে কেনা-বেচা চলেছে—হঠাৎ হয়তো সামনের মিনার থেকে ভেসে এল আজানের সুর—'লা ইল্ আল্লাহ্ আকবর, আল্লাহ্ রসুল মহম্মদ…'। হাটের কোলাহল মন্ত্রবলে স্তব্ধ হয়ে গেল। উজু ক'রে যে যেখানে পারলো, নামাজে বসে গেল। নামাজ শেষ হলে, ছেদ-টানা কেনা-বেচার কথাবার্তা আবার শুরু হল। যেন কিছুই হয় নি মাঝখানে।"

·

"Fasten your belt !…"

লাল আলোটা জ্বলে উঠলো। যাত্রা হবে শুরু। যাত্রীরা কোমর বাঁধছে। দিগন্তে শুরু হয়েছে হোলী। প্রপেলারগুলো গর্জে উঠলো। 'কমেট ফোর' নড়ে উঠলো। চলতে থাকলো রান্‌ওয়ের ওপর দিয়ে। টার্মিনাস বিল্ডিং থেকে হেনরীর দূরত্ব বাড়ছে। দূরত্ব বাড়ছে এয়ারপোর্টের ফেন্সিং থেকে। আট বছর আগের সেই বিদায়ক্ষণে ঐখানে দাঁড়িয়েছিল এমিলি—হেনরীর প্লেনের দিকে তাকিয়েছিল ব্যথাতুর নয়নে। আজ ওখানে এমিলি নেই। কোথায় সে? থাক্।…

মাটির সঙ্গে হেনরীর দূরত্ব বাড়ছে। এমিলির সঙ্গে হেনরীর দূরত্ব বাড়ছে। সে ভেসে চলেছে অর্থের আকর্ষণে। না। পালিয়ে যাচ্ছে স্বার্থপর সমাজের কারাগার থেকে। সুজলা শস্যশ্যামলা জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে, জলহীন ফলহীন শস্যহীন মরুভূমিতে—বেদুইনের দেশে।

সেখানে চরণতলে বিশাল পাইপ-লাইন। পাইপ-লাইন

বেছুইনের বৃত্তি বদলিয়েছে। বৈশিষ্ট্য ভুলিয়েছে। আতিথেয়তা যাদের আদর্শ ছিল, তারা সময় সময় অতিথিদের ভীতির কারণ হয়ে দেখা দেয়। তাইতো অয়েল কম্প্যানীর কোনো বিদেশী কর্মচারী সপরিবারে যায় না ওদেশে। হেনরীও এমিলিকে নিয়ে যায় নি। ওদেশে নারীর সংখ্যা কম। ওরা মেয়েদের বোর্খার আড়ালে রাখে।

বোর্খার আড়ালে থাকলেও মেয়েরা কিন্তু পটের বিবি নয়। বিশেষ করে বেছুইন সমাজে। স্থান পরিবর্তন করার সময় মেয়েদের কর্মতৎপরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ওরা খুব ভোরে রওনা হয়। বাঁধাছাঁদা, মালপত্র উটের পিঠে তোলা, এমন কি নূতন জায়গায় সেগুলো নামানো পর্যন্ত—সবই মেয়েরা করে। পুরুষরা শুধু বসে বসে তদারক করে আর কফি খায়। রওনা হবার মুখে মেয়েরা বোর্খা পরে। উটের পিঠে চারদিক ঢাকা ট্যাসেল্ ঝোলানো এম্ব্রয়ডারী-করা হাওদায় গিয়ে ঢোকে। হাওদার দুদিকে থাকে কাঠের দুটি বিরাট অর্ধচন্দ্র। আসলে ভেতরে যারা, তাদেরই অর্ধচন্দ্র। আলো-বাতাসহীন বদ্ধ খুপ্রি, অসহ্য গরম, নড়েচড়ে বসার উপায় নেই—ক্রমাগত দুলতে দুলতে গা-হাত-পা সব ব্যথা হয়ে য য়।

স্থান নির্বাচনের একটা অদ্ভুত নিয়ম আছে বেছুইন সমাজে। দলের একজন এগিয়ে যায়। তার সঙ্গে থাকে দলের নিশানা—বিশেষ চিহ্ন দেওয়া অথবা বিশেষ রঙের একটুকরো কাপড়। পছন্দমতো জায়গায় কাপড়টুক বিছিয়ে দেয়। ব্যাস্। দখল নেয়া হয়ে গেল। শত অসুবিধায় পড়লেও আর কোনো দল সেখানে আসবে না।

সাধারণতঃ কুয়ো বা জলাশয়ের কাছে জায়গা বাছে ওরা। কুয়োগুলো কিন্তু অদ্ভুত। পাথর দিয়ে চারদিক উঁচু করা। দূর

থেকে বোঝাই যায় না। বেদুইনদের পথচলা দেখার মতো। সেই বাইবেলের যুগ থেকে একই রকম রয়েছে। কয়েক হাজার ছাগল ভেড়া, গরু গাধা, উট ঘোড়া আর মানুষ চলে একসঙ্গে। দু'পাশে ঘোড়ায় থাকে ছেলেরা। দলের পতাকা থাকে শেখের সঙ্গে। শেখ চলে সবার আগে।

নিচে আরব সাগরের উত্তাল জলরাশি। ফেনিল তরঙ্গ বাহু বাড়িয়ে হেনরীকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। সমুদ্র আর কমেট-ফোরের মাঝে মেঘের আবরণ। আরব ভূখণ্ডের আবাহনকে উপেক্ষা করে মেঘদল এগিয়ে চলেছে হিন্দুস্থানের দিকে। নিজেদের উৎসর্গ করতে। মিলিত হতে—পশ্চিমঘাট, বিন্ধ্যাচল আর হিমালয়ের সঙ্গে। সৃষ্ট হবে হিন্দুস্থানের প্রাণধারা—গঙ্গা যমুনা সরস্বতী, কৃষ্ণা কাবেরী গোদাবরী, ব্রহ্মপুত্র ব্রাহ্মণী বিপাশা। থারানের অধিবাসীরা যখন বাহরিন থেকে পাইপ দিয়ে বয়ে আনা জলে তৃষ্ণা মেটায়, হিন্দুস্থানের দুকূল-প্লাবিনী নদীতে তখন হাজার হাজার বজরা ভাসে। ঘাটে ঘাটে পুণ্যার্থীদের ভিড় জমে।

শুধু জল আর জল ! দিগন্ত গিয়ে সাগরে মিশেছে। হেনরী জানে বলেই সে বুঝতে পারছে জল। অনেক ওপর দিয়ে চলেছে কমেট-ফোর। নীচে নীলের আস্তরণ। সীমাহীন সমুদ্র। আরব সাগর। যেদেশে জলের এতো অভাব, সেদেশের নামে সাগর ! আরব সাগর আরবের তৃষ্ণা মেটায় না। সাগর থেকে আরম্ভ হয়ে সাগরে শেষ হয়েছে যে বিস্তীর্ণ বালুময় ভূখণ্ড,জল সেখানে দুষ্প্রাপ্য। শহরের কথা আলাদা। কিন্তু শহর ক'টাই বা আছে। অধিকাংশ অধিবাসীরাই কুয়োর ওপর নির্ভরশীল। কুয়োগুলো বেশি গভীর করতে হয় না। কোনো কোনো জায়গায় মাত্র সোয়াশ' ফুটের মধ্যেই জল পাওয়া যায়। কুয়ো থেকে জল তোলার নিয়মটিও বড় অদ্ভূত। ছাগলের চামড়ার একটা থলিতে দড়ি বেঁধে উটের সঙ্গে

জুতে দেয়া হয়। উট একবার কুয়োর পাড় বেয়ে উঠে আসে, আরেকবার নেমে যায়।

উট আরবদের প্রধান সহায়। ওরা উটের লোম দিয়ে কম্বল, তাঁবু, দড়ি, এমনকি পরিধেয় তৈরি করে। উটের দুধ খায়, মাংস খায় আর চামড়া নানা কাজে লাগায়। তবু ওরা উটকে ভালবাসে না, ভালবাসে ঘোড়া। ঘোড়া মরুভূমিতে চলতে পারে না। ঝোপঝাড় খেতে পারে না। জল ছাড়া থাকতে পারে না। তবে রক্ষে যে, মরুভূমির মাঝে মাঝে রয়েছে ওয়াদি বা উপত্যকা—বাইবেলের যুগের ধ্বংসাবশেষ। সব ওয়াদিতেই যে জল পাওয়া যায়, তা নয়, তবে কোনো-কোনোটিতে ক্ষীণ জলধারার সাক্ষাৎ মেলে।

ক্ষীণ হলেও সে-জল বড়ই শীতল, বড়ই মিঠে—অতীতের ধারা বলেই বোধ করি। অতীতের সব কিছুই মধুর। হেনরীর প্রথম যৌবনের সেই দিনগুলিও।

“আপনাকে একটা কেক দেবো ? ··”

এয়ার-হোস্টেসের প্রশ্নে হেনরীর চিন্তায় ছেদ পড়ে। খিদে নেই, তবুও ‘না’ করতে পারে না। যৌবন বিগতপ্রায়, কিন্তু সুন্দর মুখের প্রতি মায়া এখনো কাটে নি। হাত বাড়ায়। ঠিক যেমনি করে বাড়িয়েছিল সেই রোমান্টিক মধ্যাহ্নে, এলিফ্যাণ্টার পর্তুগীজ কামানটার সামনে বসে···

এমিলিকে এগিয়ে দিতে হেনরী এসেছিল মানমদ। এমিলির সখীদের দুষ্টু হাসিকে অবহেলা করে ওরা পায়চারি করেছে প্ল্যাটফর্মে: ওদের হৃদয়ের দাবিকে উপেক্ষা করে ভুস্‌ওয়াল প্যাসেঞ্জার ঠিক সময়ে মানমদে হাজির হয়েছিল। হেনরী আর গাড়িতে ওঠে নি। সে দাঁড়িয়েছিল প্ল্যাটফর্মে, এমিলির একখানি হাত ধরে। এমিলির

চোখ-ছুটো বার বার ভরে আসছিল জলে। হেনরী কিন্তু কাঁদে নি। কৃত্রিম সংযত কণ্ঠে বলেছিল, "কাঁদছো কেন? গুডফ্রাইডের সময়ই তো আবার দেখা হবে। আমি বোম্বে যাবো। স্টেশনে আসা চাই কিন্তু।"

এমিলি তবু চুপ করে রয়েছে।

হেনরী আবার বলেছে, "চাই কি, আগেও যেতে পারি।"

"পারো?"

"নিশ্চয়ই।"

"তাহলে এক্ষুনি চলো না। বেশ একসঙ্গে যাওয়া যাবে।"

নড়ে উঠেছিল ভুস্‌ওয়াল প্যাসেঞ্জার। শুরু করেছিল চলতে। আশাহত এমিলি মর্মাহত হেনরীর হাতখানি আঁকড়ে ধরেছিল, নিমজ্জমানা মানুষীর মতো। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। গাড়ির গতি বাড়তেই হেনরী হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়েছিল। তৃষ্ণাতুর নয়নে তাকিয়েছিল নিষ্ঠুর ভুস্‌ওয়াল প্যাসেঞ্জারের দিকে।···

চিঠির আশায় সেই ছুটো দিনের ব্যাকুল প্রতীক্ষার কথা হেনরী ভুলতে পারবে না কোনোদিন। এর আগে ডাকপিয়নের সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক ছিল না তার। কোলকাতার পর্তুগীজ চার্চ স্ট্রীটে এক অনাথ-আশ্রমে বড় হয়েছে সে। আপনার বলতে তার কেউ ছিল না এ সংসারে। তাই ডাকপিয়নের অবদান এর আগে কোনোদিন হিসেব করে নি হেনরী।

চিঠি আসে ছ'দিন পরে—

'অজন্তা ইলোরা আমার যৌবনের বেথেলহাম। নবজন্ম লাভ করেছি তোমার সান্নিধ্যে। জগৎ যে এতো সুন্দর, জীবন যে এতো মধুর, মানুষ যে এতো মহৎ, তা আগে জানতাম না।

বোম্বে আমার শৈশবের খেলাঘর, কৈশোরের আনন্দ-নিকেতন আর যৌবনের জ্ঞানমন্দির। অথচ বোম্বে আমার জীবনে আজ

সেণ্ট্ হেলেনার ভূমিকা নিয়েছে। সেদিন গোধূলিতে মানমদ আমার মনের সবটুকু মধু নিঃশেষ করেছে। ঔরঙ্গাবাদে আমার বুকের পাঁজর ক'খানি রেখে এসেছি।

আমার সকল আশা সব আকাঙ্ক্ষা তোমাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। আমার জীবনের সূর্য, আমার আঁধার রাতের ধ্রুবতারা—তুমি একবার এসো! তোমায় দু'নয়ন ভরে দেখি। বিরহসাগরে কূল খুঁজে পাই। আমি যে অকূলে ভাসছি!

—তোমার মিলি'

কূল খুঁজে পেয়েছিল এমিলি। হেনরী এসেছিল বোম্বে। ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়ায় গেটওয়ে-অব্-ইণ্ডিয়ায় দাঁড়িয়ে, সমুদ্রের বুকে জেগে থাকা পাহাড়গুলোর পেছন থেকে ভেসে-ওঠা সূর্যকে অভিনন্দন জানিয়েছিল ওরা। উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে জুহুর বালুকাবেলায় বালির খেলাঘর রচেছে এমিলি। সমাহিত ভেহার লেকের উপরে উড়ে-যাওয়া বলাকাকুলের দিকে তৃপ্তনয়নে চেয়ে রয়েছে দুজনে। সজ্জাবিহ্বল দিশেহারা চৌপাটিতে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের বুকে ঢলে পড়া সূর্যকে বিদায় জানিয়েছে তারা। সন্ধ্যায় কমলা-নেহেরু পার্ক থেকে আলো-ঝলমল মেরিন-ড্রাইভের দিকে মুগ্ধ আবেশে রয়েছে তাকিয়ে।

হেনরী ছুটি পায় নি। একজন সহকর্মীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে পালিয়ে এসেছিল বোম্বে। বলে এসেছিল দুদিনের মধ্যেই ফিরে যাবে। কিন্তু যায় নি। এমিলি যেতে দেয় নি।

ইতিমধ্যে সহকর্মীর নির্বুদ্ধিতায় মানমদগামী একখানা মালগাড়ির সঙ্গে সেকেন্দ্রাবাদ প্যাসেঞ্জারের সংঘর্ষ হয় ঔরঙ্গাবাদ স্টেশনের উপকণ্ঠে।

দুর্ঘটনার দুদিন বাদে হেনরী ঔরঙ্গাবাদ ফিরে যায় সহকর্মীটির টেলিগ্রাম পেয়ে। গিয়ে দেখে, কর্তব্যচ্যুতির অপরাধে বরখাস্ত

করা হয়েছে তাকে। কর্তৃপক্ষ তার প্রভিডেন্ট-ফাণ্ডের নিজেদের অংশ বাজেয়াপ্ত করেছেন। টেলিগ্রাফির সার্টিফিকেট বাতিল হয়েছে। আর কোনো শাস্তি হয় নি। কারণ দুর্ঘটনায় কেউ মারা যায় নি।

ঔরঙ্গাবাদের পাট চুকলো চিরকালের মতো। হেনরী চলে এল বোম্বে। এতো তাড়াতাড়ি যে এমিলির কাছে ফিরে আসতে পারবে, কদিন আগেও ভাবতে পারে নি।

স্টেশনে এসেছিল এমিলি। গাড়ি থেকে নামতেই রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করেছিল, "এতো রোগা হয়ে গেছ কেন? নিশ্চয়ই ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া কর নি এ-কদিন।"

"না না। খাওয়া-দাওয়া করবো না কেন? তবে ভাবনা-চিন্তায় হয়তো শরীরটা একটু খারাপ হয়ে থাকবে।"

"একটু নয়, মশাই। অনেক।" একবার থামে এমিলি। তারপর উৎসাহ দেয়, "কী হয়েছে এমন? ভারী তো চাকরি। ভবঘুরের মতো আজ এখানে কাল সেখানে। না পারতাম ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে। না পারতাম আত্মীয়স্বজনের কাছাকাছি থাকতে। গেছে, বেশ হয়েছে। আবার হবে, আরো ভালো হবে।"

মনের সব বেদনা নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলে হেনরী আবার সেদিন সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, "হবে বৈ কি। নইলে আমরা বাসা বাঁধবো কেমন করে?"

স্টেশনের বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিল এমিলি। হেনরী জিজ্ঞেস করেছিল, "কোথায় যাচ্ছি?"

"শিবাজী পার্ক। একখানি ঘর হলেও, দেখবে কী সুন্দর পরিবেশ। ভাড়াটা একটু বেশি। তা হোক। বাসস্থানটা ছিমছাম না হলে মানুষের মন সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়।"

হেনরী কোনো প্রতিবাদ করে নি। নিজেকে নির্বিচারে বিলিয়ে দিয়েছে এমিলির হাতে। আত্মসমর্পণে যে এতো আনন্দ তা সে এর আগে জানতো না।

বোম্বে হেনরীর অপরিচিত না হলেও অজানা বৈ কি। তবু সে চেষ্টার কসুর করে নি। ডিসচার্জ-লেটার আর বাতিল সার্টিফিকেট নিয়ে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়েছে অফিসে অফিসে। কোনো ফল হয় নি। কেউ দোরগোড়ায় টাঙানো 'নো ভ্যাকেন্সি'র নোটিস দেখিয়ে বিদায় করেছে। কেউ-বা করুণা করে ঠিকানা লিখে রেখেছে। কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে ভদ্রতার মুখোশ খুলেছে। বলেছে, "যা শুনেছেন, সত্যি। আমার এখানে একটা ব্যবস্থা যে না করতে পারি, তা নয়। কিন্তু আপনার ডিসচার্জ-লেটারে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তাতে আপনাকে রাখা সম্ভব নয়।"

হাতের টাকা ফুরিয়ে আসছিল। তাহলেও যা ছিল তাতে চলতে পারতো আরো কিছুদিন। কিন্তু একদিন রাত্রে ঘরে ফিরে দেখে দরজাটা ভেজানো—তালা নেই। সুটকেসটি অদৃশ্য হয়েছে। হেনরী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। তাকে উপোস করতে হবে।

উপোস করতে হয় নি। এমিলি এসেছে পরদিন বিকেলে। হেনরীকে খাইয়েছে। জোর করে তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। দুজনে শিবাজী পার্কে সবুজ নরম ঘাসের উপর বসেছে। অদূরে সাগরের বিরামবিহীন উচ্ছ্বাস, আছাড়-খাওয়া ঢেউয়ের অবিশ্রান্ত কলরব। সপ্তমীর চাঁদ সাগরকে করেছে ছন্দময়, বেলাভূমিকে স্বপ্নময়, শিবাজী পার্ককে মোহময়.

হেনরীর কোলে মাথা রেখে আবদারের সুরে বলেছে এমিলি, "কথা কইছো না কেন? এই পরিবেশেও সামান্য ক্ষতিটুকুর কথা ভুলতে পারছো না?"

"সামান্য নয়, মিলি! আমি রিক্ত, আমি সর্বহারা।"

"না। তোমার সবচেয়ে বড় সম্পদ তোমার কাছেই রয়েছে।"

সত্যিই তো। কি এমন একটা গেছে তার? চাকরি একদিন সে পাবেই। যা গেছে তার বহুগুণ হবে আবার। কিন্তু তার মিলি রয়েছে—চিরকাল রইবে…

এমিলিও বলেছিল, "চাকরি তুমি পেয়ে যাবে। না পেলেও ক্ষতি নেই আপাতত। আমার একটা চাকরি হয়েছে আজ। ভাবছি এবারে বাবাকে বলবো আমাদের বিয়ের কথা।"

"তা হয় না, মিলি! তুমি একটা চালচুলোহীন বেকারকে বিয়ে করবে?"

"হ্যাঁ।" এমিলির কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়।

নীরবে কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপর এমিলি মিনতি জানায়, "লক্ষ্মীটি, তুমি অমত কোরো না!"…

একটা আকস্মিক আলোড়নে বর্তমানে ফিরে আসে হেনরী। না, তেমন কিছু নয়। এয়ার-ভ্যাকুয়ামে পড়েছিল প্লেন। তন্দ্রামগ্ন যাত্রীরা বিরক্ত হয়েছেন। রক্তচোখে এদিক সেদিক তাকিয়ে আবার ঢলে পড়ার চেষ্টা করেছেন। হেনরীর সামনেই এক সিন্ধী ভদ্রলোক। বয়সে প্রবীণ। ফরসা হলেও সুশ্রী নন। বিশাল বপুখানি কোনোমতে সীটের মধ্যে আঁটিয়ে নিয়েছেন। পাশেই পরমাসুন্দরী একটি তন্বী তরুণী। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। এ-যুগে বীরত্বের মাপকাঠি ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স। তন্বী আর্তনাদ করে উঠেছিলেন। সিন্ধী ভদ্রলোক তাঁকে অভয় দিচ্ছেন। চারিদিকে গুঞ্জন। হোস্টেস্ মাপা হাসি মুখে নিয়ে আবার আবির্ভূতা হয়। কয়েকজন যাত্রী স্মোকিং-রুমে চলে গেলেন। কমেট-ফোর লাফ দিয়ে কয়েকশ' ফুট নীচে নেমে, তাঁদের নেশার কথা মনে করিয়ে

দিয়েছে। এই নেমে যাওয়া যদি আরেকটু দীর্ঘস্থায়ী হত? কমেট-ফোর যদি আরব সাগরে আশ্রয় নিতো? তাহলে তো হেনরীর এই সমস্যাসঙ্কুল জীবনেরও হত অবসান। এই তো মানুষের জীবন! একটু এদিক-ওদিক হলেই পড়তে পারে ছেদ, হতে পারে শেষ। তবু জীবনের জন্যে মানুষের কতো মায়া, কতো মমতা। সেই জীবনের সুখ আর আনন্দের জন্যে কতো অন্যায় আর অবিচার, প্রতিহিংসা আর প্রতারণা...।

হেনরীর সুখের জন্য এমিলি নিয়েছিল চাকরি। হেনরীর সুখেই তার আনন্দ। এমিলিকে বাধা দেয় নি হেনরী। কিন্তু সে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। পাশের ফ্ল্যাটের মিস্টার নায়ার বহুদিন ফ্লাশ-খেলার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাকে। এর আগে রাজী হয় নি হেনরী। কিন্তু সেদিন সেধে গিয়ে হাতঘড়িটা বন্ধক রাখে তাঁর কাছে। সেই মূলধন সম্বল করে অড্ডায় গিয়ে বসে। টাকা চাই। অনেক টাকা।

চাইলেও পায় নি। শূন্যহাতে ফিরে এসেছে।

ব্যাপারটা কিন্তু এমিলির কাছে চাপা থাকে নি। ঘড়ির খোঁজ করতে গিয়ে সব জানতে পেরেছে। সে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেছে, "আমি কি তোমার কেউ নই? টাকার দরকার, আমাকে বল নি কেন?"

হেনরী চুপ করে রয়েছে। এমিলি তার একখানি হাত ধরে আবার বলেছে, "প্রতিজ্ঞা করো! আর কোনোদিন ফ্লাশ খেলবে না তুমি।"

"বেশ। তাই করলাম।"

উচ্ছল হয়ে উঠেছিল এমিলি। তার মাথাটি হেনরীর বুকের মধ্যে লুকিয়ে জানিয়েছিল, "বাবা মত দিয়েছেন।"

পরদিন সকালেই জিনিসপত্র-সুদ্ধ এমিলি এসে হাজির। সঙ্গে ওর ছোট বোন। বোনের সহায়তায় সারাদিন বসে নানারকম

খাবার তৈরি করেছে সে। বান্ধবীরা এসেছে বিকেলে—তাকে সাজিয়েছে বধূবেশে।

তারপর গীর্জায়—অবনত মস্তকে হোলীক্রসের সামনে দাঁড়িয়েছে দুজনে। ফাদারের সব উপদেশ শুনেছে মনোযোগ দিয়ে। হাত ধরাধরি করে অনুষ্ঠান-শেষে ঘরে ফিরেছে।

রাত তখন অনেক। নিমন্ত্রিতরা সবাই গেছেন চলে। পাশের ফ্ল্যাটের রেডিওটা এগারোটা বাজার সময়সঙ্কেত করে নীরব হয়ে গেছে। আলো নিবিয়ে দিতেই একঝলক জ্যোৎস্না এসে আছাড় খেয়ে পড়ে—ওদের সুরভিত শয্যায়। অদূরে কুয়াশাচ্ছন্ন সমুদ্র—ধ্যানমগ্ন—সমাহিত। হেনরী ভাবছিল এমিলির কথা, নিজের কথা, দুজনের কথা।

"কি ভাবছো ?"

"আমি তোমার ত্যাগের মূল্য দিতে পারব না।"

"আমি বুঝি শুধু ত্যাগই করেছি ? পাই নি কিছু ?"

হেনরী চুপ করে রয়েছে। দুটি বাহুলতা দিয়ে এমিলি তাকে বেঁধে ফেলেছে। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলেছে, "আমি যে তোমাকে পেয়েছি। আমার ইলোরার স্বপ্ন আজ সত্য হল !"

সময় গড়িয়ে চলে। হেনরী চাকরির খোঁজ ক'রে চলে যথাসাধ্য। কিন্তু সেই পরম পার্থিব বস্তুটির সন্ধান মেলে নি। এমিলি কিন্তু সেজন্যে কোনো দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে নি কোনোদিন। নিজে পরিশ্রম করেছে নিরলসভাবে। সংসারকে টেনে নিয়ে গেছে কোনোমতে। অফিস থেকে ঘরে ফিরে মনের মতো করে ঘরদোর গোছাতো সে। দু'বেলা রান্না করতো। ছুটির দিনে হেনরীর জামাকাপড় কেচে দিতো। ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতো।

কিন্তু হেনরীকে দরখাস্তের বোঝা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হতে দেখলেই ধমক লাগাতো, "আবার ঐগুলো নিয়ে বসেছ ?"

'দরখাস্তই যে বেকার জীবনের ধর্ম কর্ম ও মর্মসহচর।"

'তুমি বাড়াবাড়ি করছো। সারাদিন ঐগুলো না ঘেঁটে, ছুটির সময় আমার অফিসেও তো যেতে পারো। খানিকটা বেড়াতে পারি দুজনে।"

"সে তো তুমি একাও পারো, মিলি।"

"না, পারি না। তোমার জন্যে পারি না। তুমি একা আছো ভেবে পারি না।" রেগে গেছে এমিলি।

সন্ধি করেছে হেনরী, "বেশ। কাল থেকে তাই যাবো।"

"যেও লক্ষ্মীটি! এর পরে যে আমার আর বেড়ানো চলবে না।"

"কেন ?"

"বা রে! তাকে দেখবে কে ?"

"কাকে ?"

চট করে জবাব দিতে পারে নি এমলি। একটু বাদে মৃদুকণ্ঠে বলেছে, "তোমার সন্তানকে।"

পরদিন থেকে ছুটির সময় এমিলির অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছে হেনরী। যেদিকে মন চায় সেদিকে বেড়াতে গিয়েছে দুজনে। ঘরে ফেরার পথে টুকিটাকি নানান জিনিসের সঙ্গে রাতের খাবার কিনতো এমিলি।

সেসব দিনগুলো হেনরীর স্মৃতি-ভাণ্ডারে আজও অক্ষয় হয়ে আছে। ক'টা টাকাই বা মাইনে পেতো এমিলি? অথচ এতো শান্তি আর আসে নি তাদের জীবনে। আয় বাড়লেই সুখ বাড়ে না, শান্তি আসে না। কিন্তু শান্তি চিরস্থায়ী নয়…

প্রতিদিনের মতো সেদিনও এমিলির অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে চুরুট টানছিল হেনরী। এমিলির দেরি হচ্ছিল। ওর সহকর্মীরা বেরিয়ে যাচ্ছিল একে একে। কয়েকটি মেয়ে তার কাছে এসে হাসিতে ফেটে পড়ল। হেনরী হয়তো বুঝতে পারে নি যে, সে-হাসি তাকেই লক্ষ্য করে। কিন্তু একজন হাসতে হাসতে বলে ফেলল, "বেহায়া। অন্তঃসত্ত্বা বৌয়ের রোজগারে চুরুট টেনে বেড়াচ্ছে! চাকরি যোগাড়ের মুরোদ নেই, ছেলের শখ ষোলো-আনা।. অমন সুন্দর মেয়েটার জীবন একটা অপদার্থের হাতে পড়ে ছারখার হয়ে গেল!"

ছারখার হতে দেয় নি হেনরী। এমিলির সব অনুযোগ আর অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে মরিয়া হয়ে চাকরি খুঁজে বেড়িয়েছে।

কয়েক মাস পরেই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। খবর পেল, থারান অয়েল-ফিল্ডে কয়েকজন টেলিগ্রাফি জানা লোকের প্রয়োজন। সোজা অফিসারের সঙ্গে দেখা করেছিল সে। সার্টিফিকেটের কথা উঠলে বলেছিল—হারিয়ে গেছে। অনুরোধ করেছিল, পরীক্ষা নিতে। সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিল হেনরী।

এমিলি আপত্তি করেছিল। কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিল। হেনরী মত পাল্টায় নি। বলেছিল, "তোমার সহকর্মীদের বলে দাও, অপদার্থ নই আমি। তারপর চাকরি ছেড়ে দিয়ে মনের মতো করে মানুষ কারো ডেভিডকে। আমাদের ছেলে যেন ওদের সবার ছেলের চেয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে এ সংসারে।"

সে সাধ পূর্ণ হয় নি। এমিলি ডেভিডকে মানুষ করার দায়িত্ব নেয় নি। তাকে দিয়েছে কনভেন্টে। এমিলির সময় কম। আগে প্রতি রোববার তাকে দেখে আসতো। বহুদিন থেকে তাও যায় না। আনন্দের অভাব নেই এখানে। অবিবাহিত ও বিপত্নীক

বয় ফ্রেণ্ডরা রয়েছে। অভাব শুধু অর্থের। সেই অর্থ এতদিন এমিলিকে যুগিয়ে যাচ্ছিল হেনরী। এবারে তার সে প্রয়োজন ও ফুরিয়েছে। তাই এমিলি এখন চায় হেনরীকে তার জীবন থেকে মুছে ফেলতে।

কাফে খোলাও হয় নি। সে-তিনবছর শেষ হয়েছে পাঁচবছর আগে। দশহাজার টাকার উপর জমেছিল এমিলির পাস-বইয়ে। কিন্তু টাকাটা হেনরীকে 'নষ্ট' করতে দেয় নি এমিলি। তিনবছরের বিরহের পর তিনমাসের মিলনকেই যথেষ্ট বলে মনে করেছিল এমিলি। বলেছিল, "কোনো-রকমে আর পাঁচটা বছর কাটিয়ে এসো। পাঁচবছরের কনট্র্যাক্ট করলে মাইনেও বেশি আর প্রভিডেণ্ট-ফাণ্ডের রেট-ও বেশি।"

এমিলি হেড-অফিসে থেকে রিনিউয়্যাল ফর্ম নিয়ে এসেছে। হেনরী শুধু সই করেছে। এমিলিই লিখে দিয়েছে সব।

সেবারেও এমিলি এসেছে সাণ্টাক্রুজে। তবে সে অতটা ভেঙে পড়ে নি। অতো বেশি বিচলিত হয় নি।···

একদিন মানুষ সৃষ্টি করেছিল অর্থ—নিজের প্রয়োজনে। আজ অর্থ সৃষ্টি করছে মানুষ—নিজের খেয়ালে। আশ্চর্য মানুষের মন—বুঝেও বোঝে না। সে মৃগের মতো ছুটে চলে মরীচিকার পেছনে। ভাবে—সুখ ও শান্তির বন্ধ-দুয়ার খুলে যাবে সোনার কাঠির পরশে। খোলা দুয়ার দিয়ে সে যে-জগতে পৌঁছায়, সে-জগতে জৌলুস আছে—জীবন নেই, মোহ্ আছে—মমতা নেই, ভ্রান্তি আছে—শ্রান্তি নেই। সোনার কাঠিই সেখানে ভালবাসার মাপকাঠি। সংবিৎ যখন ফিরে আসে তখন সে নিরুপায়। ফেলে-আসা জগতের দুয়ার চিররুদ্ধ। শত সোনার কাঠির ছোঁয়ায়ও সে-দুয়ার আর খোলে না!···

প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল হেনরী। কোনোরকমে সামলে নেয় নিজেকে।

"Fasten your belt !"

লাল লেখাটা কখন জ্বলে উঠেছে, খেয়ালই করে নি হেনরী। রান্‌ওয়ের ওপর দিয়ে এগুচ্ছে প্লেন। তবে কি বাহরিন এসে গেল ? হ্যাঁ। বাহরিন-ই তো।

নিশ্চল হয়েছে কমেট-ফোর। জুতোর ফিতে বাঁধতে ঝুঁকে পড়ে হেনরী। বুকপকেট থেকে মনিব্যাগটা পড়ে যায় নিচে। সঙ্গে সঙ্গে খামখানা। তাইতো ! ভুল হয়ে গেছে। সাণ্টাক্রুজে চিঠিটা ডাকে দেয়া হয় নি।

মিলি ? না, আর মিলি নয়—এমিলি কাওয়ার্ডকে লেখা হেনরীর চিঠি। এখনো সে অবশ্য কাওয়ার্ড হয় নি সরকারী ভাবে। এই চিঠিটা পেলেই হবে। এমিলির ডিভোর্স-পিটিশানে সম্মতি দিয়ে এফিডেভিট করে এসেছে হেনরী। চিঠিতে সেই সুসংবাদই দিয়েছে। বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্যাট্রিক কাওয়ার্ডকে বিয়ে করে সুখী হোক এমিলি। এমিলির কাছে তার গচ্ছিত টাকা ফেরত চায় নি হেনরী। ওর দ্বিতীয় বিয়েতে উপহার দিয়েছে। চেয়েছে শুধু ডেভিডকে। ডেভিডের ওপর এমিলির থাকবে না কোনো অধিকার। ডেভিড তার ছেলে। একমাত্র তারই।

স্নেহ অতি বিষম বস্তু

"ইওর অনার! অপরাধী যখন সুস্থ মস্তিষ্কে, সুপরিকল্পিত উপায়ে অপরাধ করে, তখন সে আগে থেকেই তার অপরাধের সমস্ত প্রমাণ নির্ভুলভাবে নিশ্চিহ্ন করার ব্যবস্থা করে নেয়। বিশেষ করে অপরাধী যদি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হয়। স্বাভাবিক-ভাবেই আমাদের এক নম্বর আসামী ডাক্তার রণেন বাসু রয়, এম. বি. বি. এস., ডি. টি. এম., তাঁর এই কুকর্মের সকল প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার ব্যবস্থা করেই এই পাপকার্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই প্রচেষ্টায় তিনি খানিকটা সফলতাও অর্জন করেছেন। আর এই সফলতা কেবল তাঁর বুদ্ধিবলেই সম্ভব হয় নি, দৈবও তাঁকে সাহায্য করেছে। অথবা বলব সেই আকস্মিক ঘটনাগুলোকে আসামী এমন সুনিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন যে আপাত দৃষ্টিতে তাঁকে নিরপরাধী বলেই মনে হচ্ছে।

"কিন্তু ধর্মাবতার! আপনার সুদীর্ঘ সাফল্যময় কর্মজীবনের কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতা থেকে আপনি জেনেছেন যে কোন অপরাধী তার অপরাধের প্রমাণ সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করতে পারে না, কোথাও তার কিছু একটা ত্রুটি থেকে যায়, কারণ ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আর ধর্মকে রক্ষা করাই আদালতের প্রধান কর্তব্য। হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীতে আদালতই আজ শ্রেষ্ঠ ধর্মস্থান। তাই আদালতের অপর নাম ধর্মাধিকরণ। এই ধর্মস্থানের প্রবেশদ্বারে যে মহাপুরুষের পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি রয়েছে, সেই সত্যনিষ্ঠ জাতির জনকের প্রতিনিধি-রূপে আপনি এখানে বিরাজ করেছেন। আপনার শ্রীমুখনিসৃত বাণী আজ ধর্ম ও অধর্মের জয়-পরাজয় নিরূপণ করবে......"

বিচারকের হাতের ইশারায় সরকারী উকিলকে থামতে হয়। বিচারক বলেন, "মিস্টার ব্যানার্জি! আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি আমার কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। আমার কর্তব্যবুদ্ধিকে সজাগ করার জন্য আমার প্রশস্তি গেয়ে আপনি আদালতের মূল্যবান সময়ের অপচয় করবেন না।"

"আপনার আদেশ শিরোধার্য ধর্মাবতার!" একটু থেমে সরকারী উকিল শুরু করেন, "এই শহরের বিখ্যাত বাসিন্দা রায়বাহাদুর ধীরেন মৈত্র হঠাৎ ঘটনার দিনে সন্ধ্যের সময় খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিছুদিন থেকেই তাঁর পুরণো হার্ট-ট্রাবলটা আবার একটু বেড়েছিল। এর আগে তাঁর শরীর খারাপ হলে তিনি নিজেই ডাক্তার বাসু রয়কে ফোন করতেন। কিন্তু সেদিন তিনি তাঁকে ফোন করেন নি। হয়ত ভেবেছিলেন প্রতিবেশীদের আর কুৎসা রচনার অবকাশ না দিয়ে, অন্য ডাক্তারকে ডাকাই ভাল। কিন্তু তাঁর ভাবনায় কি যায় আসে। যাঁরা এমনি একটি সুযোগের প্রতীক্ষায় দিন গুণছিলেন, তাঁরা এ সুযোগ ছেড়ে দেবেন কেন? রাত দশটা নাগাদ রায়বাহাদুর জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আর এই অছিলায় তাঁর একমাত্র পরিজন—বালবিধবা যুবতী কন্যা রমা দেবী—যিনি এই মামলায় ডাক্তার বাসু রয়কে সাহায্য করার অপরাধে দু নম্বর আসামী, তিনি এক নম্বর আসামীকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর অবৈধ প্রণয়ীর সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করতে সক্ষম......।"

"আমি প্রতিবাদ করছি ধর্মাবতার! মিথ্যে সন্দেহে আমার মক্কেল শ্রীমতী রমা এ মামলার আসামী। তাঁর বিরুদ্ধে আমার বন্ধু বিচক্ষণ সরকারী উকিল এখনও এমন কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি যে তিনি আমার মক্কেল সম্পর্কে এরূপ মানহানিকর মন্তব্য করতে পারেন। তাছাড়া আমার বন্ধুবরের

বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে শ্রীমতী রমা এই শহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিকের শিক্ষিতা ও সুন্দরী কন্যা।"

"আপনার বক্তব্য আমি পরে শুনব মিস্টার সেন! এখন আমাকে সরকার পক্ষের বক্তব্য শুনতে দিন।"

"আমি দুঃখিত ধর্মাবতার।" মিস্টার সেন ক্ষুব্ধচিত্তে আসন গ্রহণ করেন।

একটা চাপা গুঞ্জনে আদালত কক্ষ গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। উকিল মোক্তার ও দর্শকদের ভিড়ে ভরে গিয়েছে আদালত। বহুদিন এ আদালতে এমন চাঞ্চল্যকর মামলার শুনানী হয় নি। অন্যান্য এজলাসে কর্মরত উকিলরা নিজেদের মামলা মুলতুবি রেখে, হাজির হয়েছেন এখানে। বারান্দা পর্যন্ত বোঝাই হয়ে গেছে। আর উৎসাহী এই জনমণ্ডলীর দৃষ্টি নিবদ্ধ যাঁদের দিকে, তাঁরা দুজন নতমস্তকে বসে আছে কাঠগড়ায়—একখানি লম্বা বেঞ্চির দুপ্রান্তে। ডাক্তারের পরনে প্যাণ্ট শার্ট। পায়ে কোলাপুরী চপ্পল। হাতে ঘড়ি। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো। খুনী আসামীর এমন ফিট-ফাট চেহারা বেমানান।

কিন্তু রমা? ঠিক বিপরীত। তার পরনে সরু পাড়ের একখানি সাধারণ শাড়ী ও সাদা ব্লাউজ। গলায় সরু চেনের হার, দু হাতে চারগাছা চুড়ি। কানে দুটি রিং। কোঁকড়ানো কালো কেশরাশি অযত্ন অবিন্যস্ত। মনে হয় বেশ কয়েকদিন তেল পড়ে নি—জট পাকিয়ে গেছে। টানা চোখ দুটির কোলে কালি জমে উঠেছে, কেমন একটা ঘোলাটে দৃষ্টি সে চোখে। মুখখানি পাণ্ডুর। একটা অসারতা যেন তার সারা শরীরে মূর্ত হয়ে আছে। একটা অসহ্য যাতনা ও অব্যক্ত ব্যথার ভারে সে যেন নুয়ে পড়েছে।

"অর্ডার, অর্ডার।" বিচারকের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে আদালতকক্ষ সচকিত হয়ে ওঠে। গুঞ্জন স্তব্ধ হয়।

সরকারী উকিল মিস্টার সেনের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে নেন। তারপরে শুরু করেন, "ধর্মাবতার, আমার বন্ধুবর যথার্থই বলেছেন—রমা দেবী সুন্দরী। সত্যই তিনি সুন্দরী, কিন্তু তার সৌন্দর্য স্বর্গের সুষমা নয়, নরকের সম্পদ। আর সেই সম্পদই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কারণ। তাকে সন্দেহের বশে গ্রেপ্তার করা হলেও, একথা সত্য নয় যে সে সন্দেহ মিথ্যে। যথা সময়ে আমি আমার প্রমাণ পেশ করব। আর সেই প্রমাণের ফলে এও প্রমাণিত হবে যে ডাক্তার বাসু রয়ের দ্বারা এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হলেও হত্যার মূল কারণ রমা দেবী। ধর্মাবতার, যে কারণে সোনার লঙ্কা দগ্ধ হয়েছে, ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়েছে, সেই আদি ও অকৃত্রিম রূপের মোহেই আরেকটি অমূল্য প্রাণ নষ্ট হল। কিন্তু মহাকবি বাল্মীকির কালের সঙ্গে একালের পার্থক্য অনেক। তাই সেকালের সীতার সঙ্গে একালের রমার পার্থক্যও স্বাভাবিক। স্বভাবতই আমরা কেবল রাবণের উত্তরপুরুষ অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করেই আমাদের কর্তব্য শেষ করব না, সেই সঙ্গে অপরাধের উৎস রুদ্ধ করে দেবার ব্যবস্থাও করব।"

একটু থেমে সরকারী উকিল টেবিলের ওপরে রাখা জলের গ্লাস থেকে এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে আবার আরম্ভ করেন, "এই উৎস আবিষ্কার করতে হলে ধর্মাবতারকে ধৈর্যধারণ করে একটি কাহিনী শুনতে হবে। সাধারণতঃ কাহিনী বলতে আমরা যা বুঝি, এটি তেমন নয়। কারণ এ কাহিনী মিথ্যে মুখরোচক গল্প নয়, নিতান্তই সত্য ঘটনা। তবে আপনি এবং জুরি মণ্ডলী সেই সত্যকাহিনী শুনে স্বীকার করবেন যে বাস্তব কল্পনার চেয়েও অলীক হতে পারে এবং জগতে অসম্ভব বলে কিছুই নেই।

মানুষ মোহের বশে কত ছোট, কত হেয়, কত ঘৃণ্য হতে পারে, এ কাহিনী তারই উদাহরণ। এ এক বিচিত্র আসক্তির চির নতুন ইতিহাস।

"আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিন থেকে ডিপ্লোমা পেয়ে ডাক্তার বাসু রয় এই শহরে এসে ডাক্তারী শুরু করেন। তাঁর লার্নেড এডভোকেট নিশ্চয়ই বলবেন যে আপন অধ্যবসায় বলে তাঁর মক্কেল অত্যন্ত অল্প সময়ে শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলে পরিণত হন।"

"আপনি ভুল করছেন মিস্টার ব্যানার্জি, এক নম্বর আসামী ডাক্তার বাসু রয় স্বপক্ষে কোন এডভোকেট নিয়োগ করেন নি। আমি দু নম্বর আসামী রমা দেবীর তরফ থেকে এই আদালতে হাজির হয়েছি।" মিস্টার সেন উঠে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করেন।

"ব্যাপারটা কি একই দাঁড়াচ্ছে না মিস্টার সেন? আপনি ওদের আলাদা করার চেষ্টা করছেন কেন?" সরকারী উকিল মৃদু হেসে প্রশ্ন করেন।

"না। কারণ মহামান্য আদালতের এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এক নম্বর আসামী অর্থবান হওয়া সত্ত্বেও কোন এডভোকেট নিয়োগ করেন নি।"

"কারণটা আপনি জানেন কি?"

"কারণ, তিনি জানেন যে তাঁকে মিথ্যে মামলায় জড়ানো হয়েছে এবং চিরকাল সত্যের জয় হয়ে এসেছে। তাঁর স্থির বিশ্বাস, তিনি এবং রমা দেবী এই মিথ্যে মামলার দায় থেকে বেকসুর খালাস পাবেন।" মিস্টার সেন আসন গ্রহণ করেন।

"দেখা যাক সে বিশ্বাস কতটা সত্য হয়।" তারপর বিচারকের দিকে তাকিয়ে সরকারী উকিল বলতে থাকেন, "অযথা আপনার সময় নষ্ট হবার জন্য আমি দুঃখিত ধর্মাবতার। যাই হোক এবার

আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক—রমা দেবীর পক্ষাবলম্বী আমার বিচক্ষণ বন্ধু বলবেন, আপন অধ্যবসায় ও দক্ষতা বলে ডাক্তার বাসু রয় মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে এ শহরে বিখ্যাত চিকিৎসক হয়ে উঠেছেন এবং তাই রমা দেবী তাঁর পিতাকে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখে তাঁকেই কল দিয়েছেন। হয়ত আরও বলবেন যে ডাক্তার বাসু রয় গত পাঁচ বছর ধরেই রায়বাহাদুরের গৃহ-চিকিৎসক, কাজেই রমা দেবী তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

"তাঁর এ যুক্তি খণ্ডন করার আগে আমি আর একটি কথা বলে নিতে চাই, সেটি হচ্ছে ডাক্তার হিসেবে বাসু রয়ের যোগ্যতার কথা। ডাক্তার বাসু রয় চিকিৎসক হিসেবে এ শহরে বিখ্যাত সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল এই খ্যাতির জন্য কতটা যোগ্যতা আর কতটাইবা সুপারিশের জোর। আমি বলব যোগ্যতা নয়, সুপারিশের জোরেই তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন। আর সে সুপারিশ রায়বাহাদুর ধীরেন মৈত্রের। রমা দেবীর মায়ের চিকিৎসা করার সুযোগ পেয়েই তিনি জাতে উঠেছেন। তিনি রায়বাহাদুরের স্ত্রীকে বাঁচাতে পারেন নি কিন্তু রায়বাহাদুরের প্রিয়পাত্র হতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরই সুপারিশে এই শহরের অভিজাত সমাজে পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ আসামী শুধু তাঁর পসারের শ্রীবৃদ্ধিতেই সন্তুষ্ট থাকেন নি। রায়বাহাদুরের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর বালবিধবা যুবতী কন্যার অতৃপ্ত যৌবনের জ্বালা জুড়িয়ে নিজের কামনা চরিতার্থ করেছেন। স্নেহান্ধ পিতা প্রথমে কিছু বুঝতে পারেন নি। পরে বুঝতে পেরেও মাতৃহীনা একমাত্র কন্যাকে শাসন করতে পারেন নি। রমা ও রণেনের সম্পর্ক নিবিড় হতে নিবিড়তর হয়েছে। তবে রায়বাহাদুর যখন টের পেয়েছেন যে ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর মেয়ের মেলামেশা নিয়ে সারা শহরে দুর্নাম রটেছে, তখন তিনি ডাক্তারকে ডাকা বন্ধ করে দিয়েছেন কিন্তু

তাতে নিষিদ্ধ প্রেম নির্বাণ লাভ করে নি। অবৈধ আসক্তি চিরকাল দুর্জয়। মোহগ্রস্ত নর-নারীর কোনকালে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

"তবে তাঁদের এই ব্যভিচারের বাধা হয়ে দাঁড়াল একজন—রায়বাহাদুর নয় গোবিন্দ। ডাক্তার বাসু রয়ের ভৃত্য। সন্তানতুল্য মনিবের এই অধঃপতনে স্থির থাকতে পারল না সে। সব জানিয়ে কর্তামাকে চিঠি লিখল। বুদ্ধিমতী বিধবা মা যিনি এই আদালতে এসে সেদিন প্রিয়তম পুত্রকে কাঠগড়ায় দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, তিনি পুত্রের সেই অপকীর্তির কথা শুনে বিচলিত হলেও কর্তব্যবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেন নি। তাঁর সন্তানকে ব্রাহ্মণ বিধবার কামনাবহ্নি থেকে রক্ষা করার জন্য নিজের অসুখ বলে ছেলেকে মিথ্যে তার করেন। আসামী তাঁকে দেখতে গেলে, পাশের গাঁয়ের জমিদার কন্যা মাধবী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। আমার বন্ধু বিচক্ষণ আইনজ্ঞ হয়ত বলবেন আসামীকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে একরকম জোর করেই এ বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি এই নিষ্ঠুর আদেশ মেনে নিয়েছিলেন—কারণ যে বিধবা মা পিতা-মাতার যৌথস্নেহে তাঁকে মানুষ করেছেন, তাঁর আদেশ অমান্য কর ত পারেন নি। তিনি মায়ের অশ্রু দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎকে অভিশপ্ত করে তুলতে সাহসী হন নি।

"কিন্তু আমি বলব—এত বড় একটা মিথ্যাকে অগ্নিসাক্ষী করে বরণ করার পেছনে আসামীর অন্য উদ্দেশ্য ছিল। মনের গোপন কামনা চরিতার্থ করতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্যেই তিনি মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। এর প্রমাণ আমরা পাই তখন, যখন দেখি আসামী বিয়ের পরে মাধবী দেবীর সঙ্গে একটা জয়েন্ট ইনস্যুরেন্স করেছেন এবং যৌতুকের অধিকাংশ টাকাই নিজের ব্যাঙ্ক একাউন্টে জমা করেছিলেন। মাধবী দেবীর দাদা, যিনি এখন এই আদালতে উপস্থিত আছেন, তিনি

তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন যে তাঁর বাবা মাধবী দেবীকে প্রায় ছুশো ভরি সোনার গয়না দিয়েছিলেন কারণ মাধবী দেবী সব সময়ে সেজে থাকতে ভালবাসতেন। কিন্তু মৃতদেহে এক রত্তি সোনাও পাওয়া যায় নি।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন, আসামী অর্থলিপ্সার জন্মই এই হত্যা করেছেন!" বিচারক সহসা সরকারী উকিলকে প্রশ্ন করেন।

"হ্যাঁ, ধর্মাবতার।"

"কিন্তু যতদূর জানা যায়, ডাক্তার বাসু রয় তো যথেষ্ট রোজগার করেন।"

"হ্যাঁ, তাঁর আয় ভালই ছিল, তবে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় ধর্মাবতার। প্রয়োজন জিনিসটা আপেক্ষিক। কেউ ছুশো টাকা আয় করে সুখে সংসার করেন, আবার কেউ ছু হাজার টাকা রোজগার করেও নিয়মিত দেনা করে থাকেন।"

"এ উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় মিস্টার ব্যানার্জি। পুলিস রিপোর্টে আমরা আসামীর জীবনযাত্রার যে বিবরণ পেয়েছি, তাতে তো মনে হয়, তিনি সরল ও অনাড়ম্বর জীবনই যাপন করতেন।"

বিচারকের মন্তব্যে মিস্টার সেনের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু সরকারী উকিল কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বিচারকের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করেন, "ধর্মাবতার! লোভ কখন কি ভাবে কার মনে সঞ্চিত থাকে, তা আপাত দৃষ্টিতে উপলব্ধি করা যায় না। এই উপলব্ধির জন্য গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন। মোহ মানুষকে কোথায় টেনে নামাতে পারে, তার বহু নজীর আমরা দেখেছি। আলোচ্য হত্যা যতই মর্মান্তিক হোক, সেই হীন-নজীরেরই আর একটি নিদর্শন। আমার জেরার উত্তরে গতকাল আসামী এই প্রকাশ্য আদালতে দ্বিধাহীন কণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে তিনি রমা

দেবীকে ভালবাসতেন নয়, ভালবাসেন এবং আমৃত্যু তাঁকে ভালবাসবেন।"

সরকারী উকিল সহসা চুপ করেন। টেবিলের উপর থেকে জলের গ্লাসটি তুলে এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে আবার শুরু করতে চান। কিন্তু পারেন না। মিস্টার সেন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "আমি দুঃখিত ধর্মাবতার, একটা কথা না বলে পারছি না। ডাক্তার বাসু রয় আমার মক্কেলকে ভালবাসেন বলেই নিশ্চয় এটা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে না যে তিনি তাঁর স্ত্রী মাধবী দেবীকে ভালবাসতেন না। আজও আমাদের সমাজে একাধিক স্ত্রীকে নিয়ে সুখে সংসার-ধর্ম পালন করে জীবন কাটিয়ে দেবার অজস্র উদাহরণ আছে। আমি পৌরাণিক কালের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।"

"আপনার বক্তব্য আমার মনে থাকবে মিস্টার সেন। এবারে সরকার পক্ষকে বলতে দিন।" বিচারকের উক্তির পরে মিস্টার সেন আসন গ্রহণ করেন।

সরকারী উকিল মিস্টার ব্যানার্জি বলতে আরম্ভ করেন, "ধর্মাবতার, ভালবাসা স্বর্গের অবদান। প্রেম ভক্তিমার্গের প্রথম আচরণ। যে পাষণ্ড নিজের ঘরে শিশুর মতো সরল, ফুলের মতো পবিত্র আর দেবীর মতো মহীয়সী ধর্মপত্নীকে ফেলে, ভিন-জাতের এক বিধবার ঘরে রাত্রিবাস করতে পারে, তার এই অবৈধ আকর্ষণকে আমরা ভালবাসা বলতে পারি না, প্রেম বলে অভিহিত করতেও পারি না। একে আমরা বলব মোহ। আর মোহের জন্যই তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল প্রচুর অর্থের। ধর্মাবতার আমার বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ আমি মহামান্য আদালতের সামনে ডাক্তারের লেখা একখানি চিঠি পেশ করছি—

'রমাপ্রিয়া,

সপ্তমীর চাঁদ বুঝিবা ক্লান্ত হয়ে, শ্রান্ত হয়ে পড়েছে ঘুমিয়ে।

ঘুমিয়েছে আরও একজন—ঘুমোচ্ছে আমার পাশে। তাকে তুমি চেনো না। আমিও চিনতাম না কিছুক্ষণ আগে। এখনও চিনেছি বলতে পারি না। অথচ অচেনা সেই মেয়েটির জীবনকে বেঁধে দেয়া হয়েছে আমার জীবনের সঙ্গে। সে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে ঘুমিয়ে। আর আমি না-ঘুমিয়ে তোমার কাছে এই চিঠি লিখছি। বিরহী যক্ষ লিপি পাঠাচ্ছে প্রিয়তমাকে।

আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে এই বিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই অনুষ্ঠানে আমার কোন কর্তব্য বর্তায় নি। শুধু কিছুদিন সংযত হয়ে থাকতে হবে। সংসারী হবার ভান করতে হবে। যতদিন না প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয় করতে পারি। তারপরে দুজনে পাড়ি জমাবো অন্য কোন দেশে। যেখানে ব্রাহ্মণ আর কায়েতের কোন ভেদ নেই, যেখানে ভালবাসাই সবচেয়ে বড় ধর্ম।

শুধু সেই কটা দিন প্রতীক্ষা কর প্রিয়তমা। ভয় নেই, আমার সমাজপত্নীর বাহুডোরে আমি কখনও বাঁধা পড়ব না। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো লক্ষ্মীটি......'

বাকী অংশটা অমার্জিত ও অপ্রয়োজনীয় কাজেই সেটুকু আমি আর সর্বসমক্ষে পাঠ করছি না।"

সরকারী উকিল চিঠিখানি পেস্কারের হাতে দেন। আদালত-কক্ষ আবার গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। পেস্কার চিঠিখানি বিচারকের হাতে দেন। বিচারক একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "ডাক্তার বাসু রয়, এই চিঠিখানি দেখে বলুন, এখানা আপনার লেখা কি না?"

বিচারক চিঠিটা পেস্কারকে দেন। পেস্কার কাঠগড়ার কাছে আসতে চান। কিন্তু তার আগেই ডাক্তার উঠে দাঁড়ায়, স্থির কণ্ঠে উত্তর দেয়, "ধর্মাবতার ও চিঠি আমারই লেখা।"

"আপনি না দেখেই স্বীকার করছেন ?"

"হ্যাঁ ধর্মাবতার ! ও চিঠির প্রতিটি ছত্র আমার আজও মনে আছে।" ডাক্তার অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দেয়।

"আপনি আজও কি এই মত পোষণ করেন ?" বিচারক প্রশ্ন করেন।

"না। বিয়ের রাতে আমার যা মনে হয়েছিল. এ চিঠি তারই বার্তাবহ। তারপরে মাধবীর সঙ্গে পরিচিত হবার পরে আমার মতপরিবর্তন হয়েছে।"

"কিন্তু কালও তো আপনি বলেছেন যে আপনি রমা দেবীকে এখনও ভালবাসেন।"

"বাসি বৈ কি। চিরকাল ভালবাসব। কিন্তু আমি মাধবীকেও ভালবাসতাম ধর্মাবতার। সেও আমাকে খুবই ভালবাসত। তবে আমি ওদের দুজনকে নিয়েই সুখী হতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম মাধবীর প্রেম আমার সংসার জীবনকে শান্তিময় করে তুলবে আর রমার প্রেম আমার কর্মজীবনকে মহীয়ান করবে। তাই মাধবীকে আমি বলেছিলাম রমার কথা। কিন্তু সে বলেছিল, রমার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে। আমি তা মেনে নিতে পারি নি ধর্মাবতার। আর এই নিয়েই আমাদের সংসারে সব সময় অশান্তি লেগে থাকত। মাধবী আমার কোন কথাই বিশ্বাস করত না, সর্বদা আমাকে সন্দেহ করত।. তার সন্দেহের বিষে আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। তাই সেদিন রাতে রমাকে কাছে পেয়ে আমি মাধবীর কাছে ফিরে আসতে পারি নি। মাধবী ফোন করে আমাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলেছে, তবু আমি আসি নি ধর্মাবতার। এলে হয়ত এতবড় দুর্ঘটনা ঘটত না।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন মাধবী দেবী আপনাকে রমা

দেবীর বাড়িতে রাত্রিবাস করতে দেখে লজ্জায় ও ঘৃণায় আত্মহত্যা করেছেন।”

“না ধর্মাবতার, সে নিজেকে খুবই ভালবাসত, সে আত্মহত্যা করতে পারে না। তা ছাড়া নিজের বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়ে ওভাবে কেউ আত্মহত্যা করতে পারে না। তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।”

“কাকে আপনার সন্দেহ হয় ?”

“আমার সন্দেহে কি যায় আসে ? আমি খুনী আসামী।”

ডাক্তারের জবাবে বিচারক একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন, ইশারায় সরকারী উকিলকে সওয়াল শুরু করতে বলেন। ডাক্তার নিজের আসনে বসে। পেস্কার চিঠিখানি নথিভুক্ত করেন। সরকারী উকিল উঠে দাঁড়িয়ে আবার বলতে থাকেন, “অতএব দেখা যাচ্ছে, রমাকে নিয়ে আসামীর দেশত্যাগী হবার পথে প্রধান প্রয়োজন ছিল অর্থের। আর মাধবীর মৃত্যু হলে এই অর্থ সংগ্রহের পথ সহজ হয়ে যায় কারণ তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকার জয়েন্ট ইন্‌স্যুরেন্স করেছিলেন।

“এই প্রসঙ্গে আমি আদালতের কাছে আর একখানি কাগজ দাখিল করতে চাই—এই পাসপোর্ট দরখাস্তখানা। অপরাধী এতে ইউরোপে যাবার অনুমতি চেয়েছেন। কারণস্বরূপ বলেছেন—হায়ার স্টাডিজ।” সরকারী উকিল কাগজখানি পেস্কারের হাতে দেন। বিচারক চোখ বুলিয়ে কাগজখানি ফিরিয়ে দেন পেস্কারকে।

“কিন্তু এর থেকে প্রমাণিত হয় না যে ডাক্তার বাসু রয় রমা দেবীকে নিয়ে দেশত্যাগী হবার জন্য পাসপোর্টের দরখাস্ত করেছিলেন। কারণ তাহলে ডাক্তার নিশ্চয়ই রমা দেবীকে দিয়েও দরখাস্ত করাতেন।” মিস্টার সেন উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন।

"ডাক্তার বাসু রয় চেয়েছিলেন, তিনি নিজে আগে বিলেত গিয়ে গুছিয়ে বসে, পরে রমা দেবীকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন। ধর্মাবতার, যদি আসামী এই ন্যায় বিচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতেন, তা হলে আজ তিনি সাগর পাড়ি দেবার আয়োজনে ব্যস্ত থাকতেন।" সরকারী উকিল একবার থেমে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নেন। তারপরে আবার বলতে থাকেন, "বিরোধী পক্ষের সুপণ্ডিত আইনজ্ঞ বলেছেন আসামী ঘটনার রাতে সাড়ে দশটার সময় রায়বাহাদুরের বাড়িতে পৌঁছন এবং তিনি রাত এগারোটা চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত তাঁর শয্যা-পার্শ্বে থাকেন। কিন্তু পরদিন ভোর পৌনে পাঁচটায় বাড়ি ফেরেন। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী মাধবী দেবীর মৃত্যু হয়েছে রাত বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে। কাজেই অপরাধী মাধবী দেবীকে হত্যা করতে পারেন না। অথচ রায়বাহাদুরের নার্স থেকে শুরু করে সে বাড়ির ঝি চাকর ও দারোয়ান কেউই অপরাধীর রাত্রিবাসের কথা জানে না।...আপনি বসুন, মিস্টার সেন, আমি জানি আপনি কি বলতে চাইছেন...হ্যাঁ, বলতে লজ্জা করলেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এই শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিতদের অন্যতম রায়বাহাদুর ধীরেন মৈত্রের বিধবা যুবতী কন্যা পুলিসের কাছে প্রকাশ করেছেন যে রায়বাহাদুরের ঘর থেকে তিনি সকলের অগোচরে অপরাধীকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছেন এবং রুদ্ধদ্বার কক্ষে তাঁরা ভোর সওয়া চারটে পর্যন্ত একসঙ্গে ছিলেন। তাঁর এই উক্তি আমাদের কথাসম্রাট শরৎচন্দ্রের দেবদাস ও পার্বতীর কথোপকথনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—যেখানে দেবদাসের প্রশ্নের উত্তরে পার্বতী বলছে—কলঙ্ক রটলেও একটা উপায় হতে পারে।

"এখানে রমা দেবী নিজে কলঙ্কিনী হয়ে প্রিয়তমকে রক্ষা করতে চাইছেন।"

সকলের দৃষ্টি পড়ে রমার দিকে। রমা তেমনি নত মস্তকে বসে আছে। ভালভাবে তার মুখ না দেখা গেলেও বুঝতে পারা যাচ্ছে তার গাল বেয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে আদালতের মেঝেতে। কঠিন পাথরে বাঁধানো মেঝে, অশ্রু তার বুকে কোন দাগই কাটতে পারে না।

"এবারে আসামীর পারিবারিক প্রসঙ্গে আসা যাক। পিতার আমলের ভৃত্য গোবিন্দ ও স্ত্রী মাধবীকে নিয়ে তাঁর সংসার। তিনখানি ঘর ও রান্নাঘর নিয়ে আসামীর বাড়ি। সামনে রক ও পেছনে বারান্দা রয়েছে বাড়িতে। নতুন বাড়ি, দরজা জানালাও সব হাল ফ্যাসানের। বাইরের দিকে দরজায় গা-তালা। বন্ধ করতে বা ভেতর থেকে খুলতে চাবি লাগে না। কিন্তু বাইরে থেকে চাবি ছাড়া খোলা যায় না। দু সেট চাবি। এক সেট থাকে ডাক্তারের কাছে আর অন্য সেট মাধবীর কাছে। কাজেই ডাক্তার ছাড়া আর কারও পক্ষে দরজা না ভেঙে বাড়িতে ঢোকা সম্ভব নয়। আমরা জানি বাড়ির দরজা এখনও অক্ষত আছে।

"যাই হোক, আগে গোবিন্দ রাস্তার পাশের ঘরখানিতে শুতো। ঐ ঘরখানাই ডাক্তারের চেম্বার। কিন্তু গোবিন্দ এখন থাকে হাত তিরিশেক দূরে একখানা খড়ের ঘরে। তিনজন লোকের চারখানি ঘরের দরকার হয় না। চেম্বার রাতে খালিই থাকে। গোবিন্দ পড়ে থাকত একপাশে। অসুবিধে হ'ত না কোন। তবুও আসামী মাস তিনেক আগে তিনশ টাকা খরচ করে বাড়ির উত্তর প্রান্তে তৈরি করিয়েছেন ঐ খড়ের ঘরখানি। গোবিন্দ প্রতিবাদ করেছে, ফল হয় নি কোন। গোবিন্দ অসন্তুষ্ট হয়েছে, কিন্তু ডাক্তার আমল দেন নি। অথচ গোবিন্দ সাধারণ ভৃত্য নয়। ডাক্তার বাসু রয়ের সংসারের সব দায়িত্ব ছিল তার। বাপ-মরা ছেলেকে সে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। যেমন আদর দিয়েছে, তেমনি

শাসনও করেছে। অসুখ হলে কেঁদে ভাসিয়েছে, পরীক্ষায় পাস করলে হেসে অস্থির হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় রাষ্ট্র করে বেড়িয়েছে সেই সুসংবাদ। বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে এনেছে। নিজের মেয়ের মতো করে তাকে কাজকর্ম শিখিয়েছে। কি করে ছেলের মন পাবে, বউকে সেই বুদ্ধি যুগিয়েছে। বউকে গালমন্দ করলে ছেলেকে ধমক দিয়েছে। ডাক্তার রাতে কলে গেলে বউয়ের ঘরের দোর গোড়ায় গামছা বিছিয়ে শুয়ে রয়েছে। সেই গোবিন্দর অবাধ্য হয়েছে ডাক্তার। তার জন্য এই অযথা খরচ। কারণস্বরূপ ডাক্তার বলেছেন—ও ঘরে ওষুধের গন্ধে গোবিন্দদা ঘুমতে পারত না। তা ছাড়া দুপুরবেলা কম্পাউণ্ডার থাকে, গোবিন্দদার বিশ্রামের অসুবিধে হয়।

"সরল স্নেহপ্রবণ বৃদ্ধ ভৃত্য একথায় নিশ্চয়ই পুলকিত হয়েছিল। কিন্তু আমরা পুলকিত হতে পারছি না। কারণ আমরা জানি আসামীর উদ্দেশ্য সফলের সবচেয়ে বড় অন্তরায় ছিল গোবিন্দ। সে দালানে থাকলে এই নৃশংস কাজ করা সম্ভব নয় বলেই, তিনি তাকে দালান থেকে যতটা সম্ভব দূরে, বাড়ির প্রান্তে ঘর তৈরি করে দিয়েছিলেন।

"আসামী আমার জেরার উত্তরে বলেছেন—অন্যদিনের মতো সেদিন রাতেও গোবিন্দ মাধবীর ঘরের দোরগোড়ায় শুয়ে থাকতে চেয়েছিল কিন্তু গোবিন্দর কষ্ট হবে, আর তিনি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরে আসবেন বলে, আসামী তাকে নিজের ঘরে গিয়েই শুতে বলেছেন। সরল গোবিন্দ যাকে অপত্যস্নেহে পরম যত্নে লালন পালন করেছে, সকল বিপদ-আপদ থেকে আগলে রেখেছে, সে আসামীর শয়তানী বুঝতে পারে নি। পারলে এই অঘটন ঘটত না।

"আসামীপক্ষের বিচক্ষণ এড্ভোকেট কতকগুলো উদ্ভট যুক্তি প্রদর্শন করে এই মহান আদালতের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা

করেছেন যে গোবিন্দই হত্যাকারী। একবারও এ কথাটি তাঁর মনে পড়ে নি যে প্রত্যেক অপরাধের পিছনে একটি মোটিভ থাকে।

"মাধবী দেবীকে হত্যা করার পেছনে গোবিন্দর কি মোটিভ থাকতে পারে? গোবিন্দ বৃদ্ধ, মাধবী তার কন্যাসমা—কাজেই জৈবিক-ক্ষুধার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। গোবিন্দ চল্লিশ বছরের বেশি হল, এ পরিবারের সেবা করে আসছে। অকৃতদার পঞ্চাশোত্তীর্ণ বৃদ্ধ ভৃত্য বহুকাল বেতন নেওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তার সামান্য যা কিছু প্রয়োজন হত ডাক্তার বাসু রয় না চাইতেই তাকে তা দিতেন। কাজেই অর্থলিপ্সার প্রশ্ন উঠতে পারে না।

"বিচক্ষণ আইনবিদ আমাদের শুনিয়েছেন, যেহেতু ডাক্তার বাসু রয় হত্যার সময়ে রমা দেবীর ঘরে ছিলেন এবং বাড়িতে অপর কোন তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না, সেই হেতু গোবিন্দই হত্যাকারী। বিচিত্র যুক্তি! যে পিতৃতুল্য ভৃত্য রণেন ও রমার অবৈধ প্রণয়ের কথা জানতে পেরে কর্তামাকে বলে-কয়ে ছেলের বিয়ে দিয়েছে, মাধবীকে ঘরে এনে মেয়ের মতো দেখাশোনা করেছে, সেই ধর্মভীরু সত্যাশ্রয়ী ভৃত্য এই নিষ্ঠুর হত্যা করেছে?

"মিস্টার সেন আরও একটি হাস্যকর যুক্তির অবতারণা করেছেন। যে ছোরাখানি দিয়ে মাধবী দেবীকে হত্যা করা হয়েছে সেখানির মালিক গোবিন্দ, কাজে কাজেই হত্যাকারী ডাক্তার নয়, গোবিন্দ। ডাক্তার হত্যাকারী হলে তিনি মাধবী দেবীকে অন্য উপায়ে হত্যা করতেন। আমি কিন্তু বলব ডাক্তার ইচ্ছে করেই বিষ প্রয়োগে মাধবী দেবীকে হত্যা করেন নি। তিনি সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকতে চেয়েছেন বলেই গোবিন্দর ছোরা ব্যবহার করেছেন। চেয়েছেন যাতে সবাই গোবিন্দকে সন্দেহ করে। যে বৃদ্ধ ভৃত্য অপত্যস্নেহে তাঁকে মানুষ করেছে, তাকে খুনের মামলায় জড়াতে না পারলে মনুষ্যত্ব কোথায় রইল!

"ছোরার প্রসঙ্গে ডাক্তার বাসু রয়ের বিবৃতিটি বড়ই চমৎকার। এই ছোরাখানির সঙ্গে নাকি তার পরিচয় আশৈশব। ছোটবেলায় এই ছোরাখানি তিনি রাখা দেখতেন গোবিন্দদার মাথার কাছে। কিন্তু গোবিন্দদা কখনই এখানি খাপ থেকে খুলত না। স্বভাবতই তাঁর একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল ঐ ছোরাখানির ওপরে। একদিন তাই তিনি সুযোগ পেয়ে ছোরাখানি খাপ থেকে খুলে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন খিড়কির পুকুরপাড়ে। কালী পুজোর মানসিক পাঁঠাটা বাঁধা ছিল একটা সুপারী গাছের সঙ্গে। কিশোর ডাক্তার পাঁঠার গলায় বসিয়ে দিয়েছিলেন এক কোপ। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটেছিল। পাঁঠাটা মাটিতে পড়ে ছট-ফট করতে আরম্ভ করেছিল। ভয় পেয়ে কিশোর ডাক্তার ডাক দিয়েছিলেন গোবিন্দকে। ছুটে এসে গোবিন্দ তাঁর হাত থেকে ছোরাখানি ছিনিয়ে নিয়েছিল। তিরস্কার করেছিল কিশোর ডাক্তারকে। শুশ্রূষা করেছিল সেই নিরপরাধী অবোধ ছাগশিশুর। লাভ হয় নি কোন।

"সেই থেকেই নাকি ঐ ছোরাখানিকে বড় ভয় তাঁর। আমি বলব—ভয় নয়, ভালবাসা। এই ঘটনা তাঁর অবচেতন মনে ঐ ছোরাখানিকে চির-জাগরূক করে রেখেছে। মাধবীকে হত্যা করার কথা মনে হতে স্বভাবতই তাঁর ঐ ছোরাখানির কথাই প্রথম মনে পড়েছে।

"এবারে ঘটনার শেষ অংশে আসা যাক। আসামী তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন, তিনি সকাল সওয়া চারটের সময় রমা দেবীর ঘর থেকে বেরিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ির বাইরে আসেন ও পৌনে পাঁচটার সময় নিজের বাড়িতে পৌঁছান। পেছনের দরজা খুলতে গিয়ে দেখেন দরজা খোলা। তিনি বুঝতে পারেন মাধবী তাঁরই প্রতীক্ষায় দরজা খুলে রেখেছে। ভেবেছেন শয়নকক্ষে গিয়ে মাধবীর সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু পরমুহূর্তে

মনে পড়েছে, তিনি সারারাত রমার কাছে ছিলেন, আর মাধবী তাঁরই প্রতীক্ষায় থেকে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছে। মাধবীর প্রতি অবিচার করেছেন তিনি। নিজের ওপর ধিক্কার এসেছে তাঁর। অগ্নিসাক্ষী করে মাধবীকে বিয়ে করেছেন। মাধবীর মূল্য তার কাছে রমার চেয়ে বেশি অথচ রমার জন্য তিনি মাধবীকে প্রতীক্ষমাণা রেখেছেন। নিজেকে তাঁর অপবিত্র বলে মনে হয়েছে। তাই তিনি দরজা বন্ধ করে শয়নকক্ষে না গিয়ে বাথরুমে ঢুকেছেন। স্নান করে রাতের জামা-কাপড় পালটে ধীর পদক্ষেপে এসেছেন শয়নকক্ষে। চিৎকার করে উঠেছেন। থরথর করে তাঁর সারা দেহ কাঁপতে শুরু করেছে, তার মাথা ঘুরে গেছে। তিনি মাটিতে পড়ে গেছেন। কতক্ষণ তিনি অজ্ঞান হয়ে ছিলেন বলতে পারেন না।

"জ্ঞান হবার পরে আস্তে আস্তে আবার তাঁর সব কিছু মনে পড়েছে। তাঁর চোখের সামনে ছোরা-বিদ্ধ মাধবীর মৃতদেহ। রক্তে সমস্ত বিছানা প্লাবিত। রক্ত জমে আছে কোথাও কোথাও—মাধবীর রক্ত। তাড়াতাড়ি মাধবীর বুক থেকে ছোরাখানা টেনে তোলেন তিনি। সেখানাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে মাধবীর নাড়ী পরীক্ষা করেন। কান্নায় তাঁর বুক ফেটে যেতে চায়—সব শেষ হয়ে গেছে। তাঁর অনাদৃতা অভিমানী স্ত্রীকে কেউ হত্যা করেছে তাঁরই অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে। কিন্তু কে হত্যা করল? কেন হত্যা করল?

"আলমারীর চাবিটা তখনও মাধবীর আঁচলে বাঁধা তবে তার দেহ অলঙ্কারশূন্য। কিন্তু গায়ের সেই সামান্য গয়না কখানির জন্য কেন হত্যা করবে মাধবীকে। অর্থের জন্য হলে আততায়ী নিশ্চয়ই চাবি দিয়ে আলমারী খুলে টাকা-পয়সা গয়না-গাটি সব নিয়ে যেত। নিঃসন্দেহ হবার জন্য ডাক্তার চাবিটা আঁচল থেকে

খুলে আলমারী খোললেন—না সবই ঠিক তেমনি রয়েছে কেবল মাধবী নেই।

"হঠাৎ ডাক্তারের নজর পড়েছে ছোরাখানির দিকে। চমকে উঠেছেন তিনি। এ ছোরাখানি তাঁর পরিচিত। এ ছোরা গোবিন্দদার। কিন্তু গোবিন্দদা···। না না এ অসম্ভব। ছোরাখানি হাতে নিয়ে তিনি ভাবতে থাকেন নানান কথা। একটু বাদে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। ডাক্তার ভাবেন গোবিন্দদা যথারীতি দরজা খুলতে বলছে। ছোরা হাতেই তিনি বেরিয়ে এসেছেন বারান্দায়। রক্তাক্ত হাতেই দরজা খুলেছেন। গোবিন্দ নয়—পাশের বাড়ির সুবিমলবাবু। রুগ্না মেয়েকে দেখতে যাবার জন্য তাঁকে ডাকতে এসেছেন।

"তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠেছেন—কি হয়েছে ডাক্তারবাবু, আপনার হাতে ওটা কি? আপনার জামা কাপড়ে রক্ত?

"ডাক্তার যে তাকে কোন বিশ্বাসযোগ্য উত্তর দিতে পারেন নি, তা আমরা সুবিমলবাবুর জবানবন্দীতে শুনেছি। সুবিমলবাবুর সে জবানবন্দী তো ধর্মাবতার নিজের কানেই শুনেছেন। আমি সে কথা বলে আর আমার সওয়ালকে সুদীর্ঘ করব না।

"আমার প্রশ্ন হল, এই যে সুন্দর কাহিনীটি আসামী আমাদের উপহার দিয়েছেন, এটি কি বিশ্বাসযোগ্য?

"না। এ কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নয় কারণ আসামী বলেছেন যে তিনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করে মৃতা মাধবী দেবীকে দেখে চীৎকার করে উঠেছেন। কিন্তু কেউ তাঁর সে চীৎকার শুনতে পায় নি। রমা দেবীর লার্নেড এডভোকেট হয়ত বলবেন—ডাক্তার বিস্ময়ে ও বেদনায় বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর গলা দিয়ে শব্দ বের হয় নি। আমরা কিন্তু তাঁর এ যুক্তি মেনে নিতে অক্ষম।

আসামী সাধারণ ছা-পোষা বাঙালী হলে না হয় এ কথা মেনে নেওয়া যেত, কিন্তু আসামী অভিজ্ঞ ডাক্তার। অপারেশন আর রক্ত নিয়ে যাঁর কারবার, তাঁর পক্ষে নার্ভাস হয়ে পড়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

"তা ছাড়া ডাক্তারই যে তাঁর স্ত্রীকে খুন করেছে তার আর একটি প্রমাণ। ডাক্তার তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন—গোবিন্দদা হত্যাকারী হতে পারে না। অথচ অর্থলোভী কোন আততায়ীও হত্যাকারী নয় কারণ তা হলে সে মাধবী দেবীর গয়না ও টাকা পয়সা নিয়ে পালাত। ..

"কিন্তু কে হত্যাকারী, ডাক্তার এ প্রশ্নের উত্তর দেন নি। কারণ সে উত্তর তাহলে তাঁর নিজের মৃত্যুবান হয়ে দেখা দেবে। জবানবন্দী দেবার সময় ডাক্তারের সম্ভবতঃ এ কথাটি মনে ছিল না যে গোবিন্দ হত্যাকারী না হলে তাকেই হত্যাকারী হতে হয়। কারণ গোবিন্দর ছোরা অন্য কারও হাতে যেতে পারে না।

"আর একটি কথা না বললে আমার সওয়াল অসম্পূর্ণ থাকবে। সুবিমলবাবু তার জবানবন্দীতে বলেছেন—ডাক্তারকে ঐ অবস্থায় দেখে তিনি ভয় পেয়ে গোবিন্দকে ডাকেন। গোবিন্দ বেরিয়ে আসতেই ডাক্তার ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে বলে ওঠেন—আমি তোমার বউমাকে মেরে ফেলেছি গোবিন্দদা।

"আশ্চর্য! সেই স্বীকারোক্তির পরেও আজ ছ'দিন ধরে এই মামলার শুনানী চলেছে। ধর্মাবতারকে বাধ্য হয়ে ধৈর্যধারণ করে সকলের বক্তব্য শ্রবণ করতে হচ্ছে। ধর্মাবতার, চন্দ্র সূর্য যেমন সত্য, এই মহান আদালত যেমন সত্য, আপনি ও আমি যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে এক নম্বর আসামী ডাক্তার রণেন বাসু রয়ই তাঁর স্ত্রী মাধবী দেবীকে হত্যা করেছেন ও তাঁর প্রণয়িনী,

২ নম্বর আসামী, শ্রীমতী রমা লাহিড়ী তাঁকে এই জঘন্য হত্যাকার্যে সাহায্য করেছেন।

"ধর্মাবতার! আসামীদের কঠিন শাস্তিদানের প্রয়োজন। এমন শাস্তি যার কথা শুনে অন্য কোন স্বামী তার নিরপরাধ পতিব্রতা পত্নীকে ফেলে অন্য কোন রমণীর প্রতি আসক্ত হতে সাহসী না হয়। কোন ব্যভিচারিণী যাতে কারও সুখের সংসার না নষ্ট করতে পারে। ফুলের মতো পবিত্র কোন মেয়ের জীবন যাতে না বিকশিত হবার আগেই ঝরে পড়ে। পাপী পাপ করতে ভয় পায়। মিথ্যার অবসান ঘটে এই সত্য সুন্দর ও পবিত্র পৃথিবী থেকে।"

"ধর্মাবতার, এই ধর্মাধিকরণ সত্যাশ্রয়ীর তীর্থক্ষেত্র। আপনি ভগবান বুদ্ধ, অমৃতময় যীশুখৃষ্ট ও সত্যনিষ্ঠ বিবেকানন্দের প্রতিনিধি। তাঁরা আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁদের উৎকণ্ঠিত আত্মা যেন আপনার বিচারে শান্তিলাভ করতে পারে, এই আমার প্রার্থনা।"

বিচারককে নমস্কার করে সরকারী উকিল আসন গ্রহণ করেন। চোখে তাঁর আনন্দের দীপ্তি। মুখে তাঁর পরম প্রশান্তি। দীর্ঘ-কালের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝতে পারছেন যে আসামীদের কঠিন শাস্তি হবে। তিনি অখণ্ড যুক্তি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। বিচারক ও জুরীদের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছেন।

সরকারী উকিল আসন গ্রহণ করার পরে আবার আদালত শব্দমুখর হয়ে উঠল। বিচারক কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে একমনে কি যেন লিখে চলেছেন।

সহসা বিচারক তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে উঠে দাঁড়াতে হয়। এটাই আদালতের রীতি। আদালত

আলাদা জগৎ। এখানকার চাল-চলন ভাষা ও ব্যবহার সবই আলাদা। আদালতে নিয়ম ভঙ্গ করার নিয়ম নেই।

কিন্তু যারা নতুন দর্শক তাঁরা বিচারকের এই আকস্মিক আসন পরিত্যাগে বিস্মিত হন। তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে তাকান। না, দেড়টা বাজতে এখনও দেড় ঘণ্টা বাকি। তা হলে কি আজকের মতো এখানেই শুনানী শেষ হয়ে গেল। বড় আশা ছিল, আজই তারা শেষ-বিচার দেখে যাবেন।

যারা পুরনো দর্শক, তাঁরা এ আদালতের হালচাল জানেন। তাঁরা নতুনদের ভরসা দেন—দশ মিনিটের জন্য জজসাহেব ধূমপান করতে খাস-কামরায় যাচ্ছেন, আদালতে ধূমপান নিষেধ। এ আইন বিচারকের পক্ষেও প্রযোজ্য।

নতুনরাও খুশী মনে বারান্দায় বেরিয়ে বিড়িতে আগুন দেন। ধোঁয়ার নেশা, বড়ই বেয়াড়া। সময় মতো না করতে পারলে, বুদ্ধি-সুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যায়। বুদ্ধিহীন ব্যক্তি যেমন জজিয়তী করতে পারেন না, তেমনি বুদ্ধিহীন দর্শকের পক্ষেও বিচার অনুধাবন করা অসম্ভব।

ঠিক দশ মিনিট পরে বিচারক ফিরে আসেন। মুহূর্তে নীরবতা নেমে আসে আদালতে। বিচারক আসন গ্রহণ করার পরে সবাই উপবেশন করেন। বিচারক বলেন, "মিস্টার সেন, এবারে আমি আপনার বক্তব্য শুনব।"

"ধর্মাবতারকে ধন্যবাদ।" বলতে বলতে আসামী পক্ষের উকিল মিস্টার সেন উঠে দাঁড়ান। তারপরে তিনি তাঁর নথির ফিতে খুলে নিয়ে কি একটু দেখে বলতে আরম্ভ করেন, "ধর্মাবতার, ধর্মের কল যে বাতাসে নড়ে, এটি শ্রদ্ধেয় সরকারী উকিল কিছুক্ষণ আগে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আমিও আমার বক্তব্যের

গোড়াতেই তাঁকে সেই ধর্মকথাটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার বক্তব্যের শেষে তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে কথাটি কত বড় সত্য।" মিস্টার সেন একটু থেমে রুমাল দিয়ে নিজের মুখখানি একবার মুছে নেন। তারপরে বলতে থাকেন, "ধর্মাবতার, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলেছেন, অপরাধী যখন সুস্থ মস্তিষ্কে সুপরিকল্পিত উপায়ে কোন অপরাধ করে, তখন সে আগে থেকেই তার অপরাধের সমস্ত প্রমাণ নির্ভুলভাবে নিশ্চিহ্ন করার ব্যবস্থা করে নেয়। সরকার পক্ষের মতে আসামী ডাক্তার রণেন বাসু রয় সুস্থ মস্তিষ্কে ও সুপরিকল্পিত উপায়ে গোবিন্দর ছোরা দিয়ে তাঁর স্ত্রী মাধবী দেবীকে হত্যা করেছেন এবং আসামী শ্রীমতী রমা লাহিড়ী এই জঘন্য কাজে তাঁকে সাহায্য করেছেন। যদি বন্ধুবরের এই উক্তি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমরা এটাই আশা করব যে আসামীরা আগের থেকে তাঁদের অপরাধের সকল প্রমাণ লোপের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা হয়েছে কি ?

"আমার বন্ধুবর কি বলবেন জানি না, কিন্তু আমি বলব, আসামীরা যদি হত্যাকারী হয়ে থাকেন, তবে তাঁরা প্রমাণ লোপের কোন ব্যবস্থা তো দূরের কথা বরং এমন আচরণ করেছেন যাতে তারা আসামী বলে সাব্যস্ত হন। ধর্মাবতার, কোন খুনী খুন করার পরে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে, রক্তমাখা জামা-কাপড়ে, ছোরা হাতে এসে দরজা খুলে দেয় ?

"যে আচরণের জন্য ডাক্তারকে আসামী বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেই আচরণই তাঁর নির্দোষিতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ কাজেই ডাক্তার তাঁর স্ত্রী মাধবী দেবীকে হত্যা করেন নি এবং আমার মক্কেল শ্রীমতী রমা দেবীরও মাধবী হত্যায় হত্যাকারীকে সাহায্য করার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। তাছাড়া যদি

প্রমাণিতও হত যে ডাক্তারই তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছেন, তা হলেও সরকার পক্ষ প্রমাণ করতে পারতেন না যে রমা দেবী তাকে সাহায্য করেছেন। অতএব অবিলম্বে আমার মক্কেলের মুক্তি পাওয়া উচিত।"

"কি উচিত এবং অনুচিত, তা আমার বিচার্য মিস্টার সেন। আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করুন।" বিচারক গম্ভীর কণ্ঠে মন্তব্য করেন।

"আমি আমার উক্তির জন্য অনুতপ্ত ধর্মাবতার।" মিস্টার সেন লজ্জিত কণ্ঠে বলেন। সরকারী উকিল তাঁর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসেন। সে অপমান গায়ে না মেখে মিস্টার সেন আবার শুরু করেন, "সরকার পক্ষ অস্বীকার করেন নি যে ঘটনার দিনে রায়বাহাদুর ধীরেন মৈত্র অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং রাত দশটার সময় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। শ্রদ্ধেয় সরকারী উকিল বলেছেন যে রায়বাহাদুরের জ্ঞান হারাবার অছিলায় রমা তার অবৈধ প্রণয়ী রণেনকে ডেকে পাঠান এবং দুজনে মাধবী হত্যার পরিকল্পনা করেন।

"ধর্মাবতার, রমা মাতৃহীনা। সংসারে বৃদ্ধ পিতা ছাড়া তাঁর আর কোন আপনজন নেই। অসুস্থ পিতা অজ্ঞান হয়ে যাবার সুযোগে তিনি ডাক্তারকে ডাকলেন অভিসার-রজনী যাপন করতে ও মাধবী হত্যার পরিকল্পনা করতে, এও কি সম্ভব।

"যদি ধরে নেওয়া যায় সম্ভব, তাহলেও এটা মেনে নিতেই হবে যে একই সঙ্গে ঐ দুটি কারণের জন্য তিনি ডাক্তারকে ডাকতে পারেন না। অভিসার ও হত্যাপরিকল্পনা এ দুটোই একসঙ্গে হতে পারে না। কাজেই যদি রমা ও ডাক্তার অভিসার-রজনী যাপন করে থাকেন, তবে তাঁরা মাধবী দেবীর হত্যাকারী নন।

"ধর্মাবতার, বিগত পাঁচ বছর ধরে ডাক্তার বাসু রয় রায়বাহাদুরকে চিকিৎসা করে আসছেন। তাঁর রোগের সঙ্গে ডাক্তার বিশেষভাবে পরিচিত। তবু রায়বাহাদুর রণেনকে ডাকতে নিষেধ করেছিলেন কারণ তাঁর বাড়িতে ডাক্তারের যাওয়া-আসা নিয়ে শহরে কুৎসা রটেছে। কিন্তু নতুন ডাক্তার কিছুই করতে পারলেন না। রায়বাহাদুর বুকের অসহ্য যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন। স্বভাবতই তাঁর অসহায়া মেয়ে নির্ভরশীল রণেনকে খবর দিয়েছেন। যদিও এই খবর তিনি স্বেচ্ছায় দেন নি। পিতার অমতে রণেনকে ডাকা উচিত হবে কি না, রমা যখন এই উভয়সঙ্কটের মধ্যে সময় কাটাচ্ছিলেন, তখন কেউ তাকে রণেনকে ডাকবার পরামর্শ দেয়।"

"সেই পরামর্শদাতাটির নাম জানতে পারি কি?" সরকারী উকিল উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন।

"নিশ্চয়ই।" মিস্টার সেন জবাব দেন, "তবে এখন নয়। আপনাকে কিছুকাল ধৈর্যধারণ করতে হবে মিস্টার ব্যানার্জি।"

"অতএব ধর্মাবতার, রমা রণেনকে ডেকে নেহাতই স্বাভাবিক কাজ করেছেন। যে কোন মেয়েই তখন রণেন ডাক্তারকে ডাকতেন। কারণ পিতার নিষেধ বা সমাজের অনুশাসনের চেয়ে পিতার জীবন মূল্যবান। আর ডাক্তারকে ডেকে যে তিনি ভুল করেন নি, তার প্রমাণ রায়বাহাদুর আজও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। ধর্মাবতার তাঁকে গতকাল আদালতেও দেখেছেন।"

বিচারক মাথা নাড়েন। মিস্টার সেন নথিতে নজর বুলিয়ে আবার শুরু করেন, "ধর্মাবতার, ডাক্তার বাসু রয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাধবী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তিনি তখন সাবালক। তিনি ইচ্ছে করলে মায়ের আদেশ অমান্য করতে

পারতেন। অথচ তিনি তা করেন নি কারণ তাহলে তাঁর মা মনে কষ্ট পাবেন।

"ধর্মাবতার, মা মনে কষ্ট পাবে বলে যে ছেলে পূর্ব-প্রণয়িনীর অজ্ঞাতে অপরিচিতার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে, সেই আদর্শপরায়ণ মাতৃভক্ত সন্তান কি ছোরা দিয়ে ঐ রকম নৃশংসভাবে তাঁর নিজের স্ত্রীকে হত্যা করতে পারে?

"শ্রদ্ধেয় সরকারী উকিল বলেছেন রমার মোহগ্রস্ত ডাক্তার বাসু রয় অর্থলিপ্সার জন্যই রমার সাহায্যে মাধবী দেবীকে হত্যা করেছেন। বিয়ের যৌতুকের টাকা নিজের ব্যাঙ্ক একাউণ্টে রাখা ও পঞ্চাশ হাজার টাকার জয়েণ্ট ইনস্যুরেন্স করা নাকি তাঁর এই অর্থলিপ্সার প্রমাণ—উদ্ভট যুক্তি। ধর্মাবতার, নিজের বিয়ের যৌতুকের টাকা কি মানুষ পরের ব্যাঙ্ক একাউণ্টে জমা দেয়? স্বামী-স্ত্রীর জয়েণ্ট লাইফ ইনস্যুরেন্স উভয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তার জন্যই করা হয়ে থাকে। এতে ডাক্তার বাসু রয়ের অর্থলিপ্সার প্রমাণটা কোথায়? তা ছাড়া ডাক্তারের অর্থলিপ্সা হবার পেছনে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও নেই। ডাক্তার যথেষ্ট টাকা রোজগার করেন। গত কয়েক বছর প্র্যাকটিশ করে তিনি যে টাকা সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়েছেন, তা তাঁর দেশত্যাগী হবার পক্ষে যথেষ্ট। কাজেই অর্থলিপ্সার জন্য তিনি তাঁর স্ত্রী মাধবী দেবীকে হত্যা করেছেন, এ যুক্তি হাস্যকর। ধর্মাবতার নিজেও এ যুক্তি বিশ্বাস করেন নি। তাই তখন আপনি সরকারী উকিলকে অতগুলো প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়েছেন।"

নিজের অলক্ষ্যেই বিচারক মাথা নেড়ে মিস্টার সেনের বক্তব্যে সায় দিয়ে ফেলেন। কিন্তু তারপরেই বোধ করি তাঁর খেয়াল হয় যে তিনি বিচারক। এখন তাঁর কেবলই শোনার পালা, বরং ইচ্ছে করলে দু-একটা প্রশ্ন করে অতিরিক্ত কিছু জেনে নিতে

পারেন, কিন্তু কোন মতেই এখন তিনি বক্তা হতে পারেন না। কারও মন্তব্যে সায় দেবার অধিকারও নেই তাঁর। তিনি বিচারক। বিচারককে হতে হবে নির্বিকার, হতে হবে নির্দয়, হতে হবে নির্ভুল। কাজেই পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে বিচারক তাঁর ভুল শুধরে নেন। ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে মিস্টার সেনের দিকে তাকিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শুনতে থাকেন।

"ধর্মাবতার, বিয়ের রাতে রমাকে লেখা ডাক্তারের যে চিঠিখানা সরকার পক্ষ আদালতে দাখিল করেছেন, সে সম্পর্কে ডাক্তার পরিষ্কারভাবে তাঁর বক্তব্য আদালতের কাছে পেশ করেছেন। কাজেই এ সম্পর্কে আমি বেশি কিছু বলতে চাই না। আমি শুধু এ টুকুই বলব যে ডাক্তার রমাকে ভালবাসেন বলে এটা প্রমাণিত হচ্ছে না যে তিনি মাধবীকে ভালবাসতেন না। একাধিক নারীকে ভালবেসে, এমনকি বিয়ে করে সংজীবন যাপন করার অজস্র নজীর আছে আমাদের সমাজে।

"ডাক্তার বিয়ের আগে রমাকে ভালবাসতেন। বিয়ের পরে তাঁর সেই ভালবাসা উবে যায় নি বলেই কি প্রমাণ হচ্ছে যে ডাক্তার খুন করতে পারে? ডাক্তার ও রমার প্রেম যথার্থ ভালবাসা আর এই ভালবাসাই স্বর্গের অবদান। এই প্রেমই ভক্তিমার্গের প্রথম আচরণ। তাঁদের ভালবাসা শেয়ার মার্কেটের সামগ্রী নয় যে উচা-মন্দা বাজার দেখে যখন ইচ্ছে, যেভাবে ইচ্ছে কেনা-বেচা করলেই হল।

"সরকারী উকিল বলেছেন, রূপের মোহের জন্য সোনার লঙ্কা দগ্ধ হয়েছে, ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়েছে। আমি কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করি। আমি বলি—নারীর ইজ্জত রক্ষার জন্যই সেতুবন্ধন করা হয়েছিল, শত শত রণতরী সাগরে ভেসেছিল। সেই মহাকাব্য রচনার কাল থেকে এই মহাশূন্য যাত্রার কাল পর্যন্ত মনুষ্যসমাজের

সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ নারীর ইজ্জত। শরৎচন্দ্রের পার্বতী তাঁর নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই সমাজের কলঙ্কের বোঝা স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিতে চেয়েছিলেন। আশ্চর্য, এত বড় আত্মত্যাগের একটি দৃষ্টান্তকে মিস্টার ব্যানার্জি কি কুৎসিত রূপদান করলেন।

"সরকারী উকিলের মতে রণেনকে বাঁচাবার জন্যই রমা বলেছেন যে তিনি রণেনকে সারারাত তাঁর ঘরে আটকে রেখে-ছিলেন। রমার মতো মেয়ে কোন কারণেই প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়িয়ে এত বড় মিথ্যে কথা বলতে পারে না ধর্মাবতার।"

মিস্টার ব্যানার্জি সহসা উঠে দাঁড়ান কিন্তু তিনি কিছু বলতে পারার আগেই বিচারক তাঁকে বলেন, "আপনার কিছু বক্তব্য থাকলে আমি পরে শুনব, এখন আমাকে আসামীপক্ষের বক্তব্য শুনতে দিন।"

"ধর্মাবতারের যেমন অভিরুচি।" বলে কুর্নিশ করে অসন্তুষ্ট চিত্তে আসন গ্রহণ করেন সরকারী উকিল।

মিস্টার সেন শুরু করেন, "ধর্মাবতার, সরকারপক্ষ ডাক্তারের পাসপোর্ট এ্যাপ্‌লিকেশান দাখিল করে আদালতের সামনে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ডাক্তার বিয়ের রাতে রমাকে লেখা সেই চিঠি অনুযায়ী দেশত্যাগী হবার জন্যই এই এ্যাপ্‌লিকেশান করেছেন। সেই চিঠি থেকে নাকি প্রমাণিত হয় যে ডাক্তার রমাকে নিয়ে দেশত্যাগী হতে চেয়েছিলেন। অথচ সরকারপক্ষ রমার কোন এ্যাপ্‌লিকেশান দাখিল করতে পারেন নি। তাঁদের বক্তব্য, ডাক্তার ঠিক করেছিলেন আগে তিনি নিজে বিদেশে গিয়ে স্থায়ী হবেন, তারপরে রমাকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু এই বক্তব্যের পেছনে কোন প্রমাণ নেই। এটি নেহাতই একটি কবি-কল্পনা। ধর্মাবতার, কল্পনার কোন ঠাঁই নেই

এই বাস্তবের আদালতে। অতএব আলোচ্য সরকারী বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হচ্ছে না যে ডাক্তার রমাকে নিয়ে দেশত্যাগী হবার জন্যই পাসপোর্টের দরখাস্ত করেছিলেন।" মিস্টার সেন একবার থেমে নিজের নথির ভেতর থেকে কতকগুলো কাগজপত্র বের করে সেগুলো পেস্কারের হাতে দিয়ে বলতে থাকেন, "ধর্মাবতার ডাক্তার যে সত্যই এম. আর. সি. পি. পড়ার জন্য বিলেতে যেতে চেয়েছিলেন আর তাই পাসপোর্টের দরখাস্ত করেছিলেন, তাঁর প্রমাণ এইসব চিঠিপত্র। আপনি দয়া করে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে বাধিত হব।"

বিচারক পেস্কারের হাত থেকে কাগজগুলো নিয়ে দেখতে থাকেন। মিস্টার সেন বিচারকের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন। কিছুক্ষণ পরে চিঠিগুলো পড়া শেষ করে বিচারক মিস্টার সেনকে বলেন, "আপনার পরবর্তী বক্তব্য পেশ করুন।"

"আমার বন্ধু বিচক্ষণ আইনজ্ঞ আবিষ্কার করেছেন, ডাক্তার মাধবী দেবীকে হত্যা করার সুযোগ তৈরির জন্য গোবিন্দকে আলাদা ঘর তৈরি করে দিয়েছেন। ডিস্পেনসারীতে রাত্রিবাস যে সুখনিদ্রার সহায়ক নয়, এ অভিজ্ঞতা বোধ করি বন্ধুবরের নেই। ধর্মাবতার, গোবিন্দ ডাক্তারকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর দেয়া ডাক্তারের কর্তব্য। সেই কর্তব্য থেকেই ডাক্তার তাঁকে নতুন ঘর বানিয়ে দিয়েছেন।

"সরকারী উকিল স্বীকার করেন নি যে ডাক্তার বাড়ি ফিরে দরজা খোলা পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন ডাক্তার নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে ঘুমন্ত মাধবীকে হত্যা করেছেন। কিন্তু তিনি এই মহান আদালতের কাছে এমন কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি, যা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে দরজা সত্যই খোলা ছিল না। আমিও যদি একইভাবে

বলি দরজা খোলা ছিল। তা হলে তিনি স্বপক্ষে কি যুক্তি দেবেন?"

"যুক্তি এই যে, দরজা খোলা থাকতে পারে না।" মিস্টার ব্যানার্জি উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন।

"কেন পারে না মিস্টার ব্যানার্জি।" মৃদু হেসে মিস্টার সেন জবাব দেন।

"কারণ মাধবী দেবী দরজা খুলে রেখে ঘুমোতে পারেন না।"

"খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্তু আততায়ী তো দরজা খোলা রেখে পালিয়ে যেতে পারে।"

"না আততায়ী পালিয়ে যায় নি। আততায়ী বাড়ির ভেতরেই ছিল। আততায়ী ডাক্তার নিজে।"

"কিন্তু ডাক্তার যদি আততায়ী না হন। তা হলে তো দরজা খোলা থাকতে পারে।" মিস্টার সেন হাসতে হাসতে বলেন।

"তা পারে।" বিরক্তভাবে মিস্টার ব্যানার্জি উত্তর দেন। তিনি আসন গ্রহণ করেন।

মিস্টার সেন বলতে থাকেন, "ধর্মাবতার, যেহেতু সন্দেহবশে ডাক্তারকে আসামী করা হয়েছে, সেই হেতু তাঁর সব কথাই অবিশ্বাস করতে হবে এর কোন মানে নেই। দরজা খোলা ছিল বলে ডাক্তার বাসু রয় যে বিবৃতি দিয়েছেন তা সত্য নয়, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার উপযোগী কোন যুক্তি সরকারপক্ষ পেশ করেন নি।"

বিচারক মাথা নাড়েন। মিস্টার সেন খুশি-মনে বলে যেতে থাকেন, "ধর্মাবতার, ডাক্তার গোবিন্দকে নিষেধ করেছিলেন দালানে শুতে কারণ গোবিন্দ বুড়োমানুষ, ডাক্তার ফিরে এলে আবার তাকে ঘরে গিয়ে শুতে হবে, তার কষ্ট হবে। তা ছাড়া মাধবী দেবীও বলেছিলেন গোবিন্দর দালানে থাকার দরকার নেই, তিনি

একাই থাকতে পারবেন। ডাক্তারও ভেবেছিলেন তিনি ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে ফিরে আসবেন। তাঁর এই ভাবনা মিথ্যে, এর কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু এই ভাবনা সত্যি হলে এটা প্রমাণ হয় যে ডাক্তার চিকিৎসক হিসেবেই রায়বাহাদুরের বাড়িতে গিয়েছিলেন, রমার সঙ্গে মাধবী হত্যার পরিকল্পনা করতে কিংবা অভিসার-রজনী যাপন করতে নয়। তবে অবস্থার চাপে তিনি সময় মতো বাড়ি ফিরে আসতে পারেন নি।

"ধর্মাবতার, বিবাহিত পুরুষের পক্ষে বিবাহ-পূর্ব জীবনের প্রেমিকার কাছে রাত্রিবাস সামাজিক অপরাধ সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই অপরাধের কৈফিয়ত তলব করার অধিকার সরকারী উকিলের নেই, কারণ মাধবী দেবীকে হত্যা করার অপরাধেই ডাক্তার ও রমাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। সমাজ-সংস্কার এ মামলার বিষয়-বস্তু নয়। আমি বলব সরকারী উকিল আমার মক্কেলকে অপমান করার উদ্দেশ্যেই প্রকাশ্য আদালতে ঐ সব মানহানিকর মন্তব্য করেছেন। আমার মক্কেল অনায়াসে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মকদ্দমা করতে পারেন।"

সরকারী উকিল লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। সবাই বুঝতে পারেন তিনি মোক্ষম কিছু বলবেন এবং দুই আইনজীবী তুমুল বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। কিন্তু বিচারকের হাতের ইশারায় সরকারী উকিলকে নীরব থাকতে হয়। বিচারক বলেন, "মিস্টার সেন, সমাজ-সংস্কার যেমন এ মামলার বিষয়বস্তু নয়, তেমনি সরকারী উকিলের বাক-সংস্কারও আমার বিচার-বিষয় নয়। আমি আপনাকে এই উক্তি প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করছি।"

সরকারী উকিল সন্তুষ্টচিত্তে আবার আসন গ্রহণ করেন। মিস্টার সেন নতমস্তকে বিচারককে বলেন, "আপনার নির্দেশ আমি মেনে নিলাম ধর্মাবতার।"

সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। একটা ঝড় ওঠার আগেই থেমে গেল। বিচারককে ধন্যবাদ, তাঁর সময় মতো হস্তক্ষেপের ফলে সকলে একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই পেলেন।

মিস্টার সেন বলতে থাকেন, "এবারে ডাক্তার বাসু রয়কে কেন এই হত্যাকারী সন্দেহে আসামী সাব্যস্ত করা হল, সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। পুলিসের কাছে সুবিমলবাবুর জবানবন্দী হচ্ছে তাঁর গ্রেপ্তারের প্রত্যক্ষ কারণ। পরোক্ষ কারণ, যে ছোরা দিয়ে মাধবী দেবীকে হত্যা করা হয়েছে, সেই ছোরাতে তাঁর হাতের ছাপ, ঘরের মেঝেতে তাঁর পায়ের দাগ ও মাধবী দেবীর গায়ের গয়না নিখোঁজ। ধর্মাবতার, ছোরা সম্পর্কে আমার বক্তব্য মোটামুটি সরকারী উকিল বলে দিয়েছেন। তাঁর কথা অনুযায়ীই আমরা ধরে নিলাম যে গোবিন্দকে হত্যাকারীরূপে প্রমাণ করার প্রয়োজনেই ডাক্তার কোন ডাক্তারীসম্মত উপায়ে তাঁর স্ত্রী মাধবী দেবীকে হত্যা না করে গোবিন্দর অনুপস্থিতিতে ছোরাখানি সরিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ধর্মাবতার, ছোরাখানি থাকত গোবিন্দর বালিশের নিচে তার আপদ-বিপদের হাতিয়াররূপে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে এই ছোরাখানি রোজই দুপুরে এবং রাতে তার নজরে পড়ত। ডাক্তার ছোরাখানি সরাবার পরে কি গোবিন্দর লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল না? কিন্তু পুলিসের কাছে গোবিন্দ বলেছে ছোরাখানার কথা তার মনে পড়ে নি। এ উক্তি অবিশ্বাস্য।

"মিস্টার ব্যানার্জির মতে মাধবী দেবীর অলঙ্কারশূন্য মৃতদেহই সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে ডাক্তারই অপরাধী। এ যুক্তি হাস্যকর। কারণ মাধবীর মৃত্যুর পরে ডাক্তারই তাঁর অলঙ্কারের উত্তরাধিকারী হবেন। তিনি কেন কষ্ট করে তার গা থেকে গয়না খুলে লুকিয়ে রাখতে যাবেন?

"ধর্মাবতার"" সহসা সরকারী উকিল উঠে দাঁড়ান। মিস্টার সেনকে থামতে হয়। সরকারী উকিল বলেন, "গায়ের গয়না সরানোটা ডাক্তার বাসু রয়ের একটা চাল। তিনি চেয়েছেন সবাই সন্দেহ করুক আততায়ী গয়নার জন্যই মাধবী দেবীকে হত্যা করেছে।"

"কিন্তু সে গয়না তা হলে কোথায় গেল। ডাক্তার যদি খুন করে থাকেন তা হলে তিনি খুনের পরে বাড়ি থেকে বের হন নি। অথচ পুলিস তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে গয়না উদ্ধার করতে পারে নি। তা ছাড়া আপনি সওয়ালের সময় বলেছেন যে তিনি চেয়েছেন সবাই গোবিন্দকে সন্দেহ করুক আর তাই তিনি গোবিন্দর ছোরা ব্যবহার করেছেন। তিনি কোনটা চেয়েছেন আপনি ঠিক করে বলুন মিস্টার ব্যানার্জি।'

"ছুটোই চেয়েছেন।" সরকারী উকিল জবাব দেন।

"কিন্তু তিনি তাঁর জবানবন্দীতে কোথাও বলেন নি যে গোবিন্দ হত্যাকারী। উপরন্তু গোবিন্দ সম্পর্কে তিনি যে সব কথা বলেছেন, তাতে এটাই প্রমাণ হবে যে গোবিন্দকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। গোবিন্দ তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করতে পারে, এ তাঁর ধারণাতীত। গোবিন্দ শাস্তি পেলে তিনি শাস্তি পাবেন।" মিস্টার সেন একটু থেমে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে আবার বলতে থাকেন, "কাজেই তাঁর পক্ষে গোবিন্দর ছোরা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। অতএব ডাক্তারের দ্বারা এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে পারে না। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ঐ ছোরা দিয়েই মাধবীকে হত্যা করা হয়েছে।

"ধর্মাবতার, ডাক্তার বাসু রয় যখন নির্দোষী বলে প্রমাণিত হচ্ছেন, তখন আমার মক্কেল শ্রীমতী রমাও স্বাভাবিকভাবেই এই মিথ্যে মামলা থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছেন। কারণ মাধবী হত্যায়

ডাক্তারকে সাহায্য করার সন্দেহেই তিনি আসামী বলে অভিযুক্তা। যদিও এই সন্দেহের পেছনে সরকারপক্ষ কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি। এমন কি তাঁরা যদি প্রমাণ করতেও পারতেন ডাক্তারই মাধবীকে খুন করেছেন, তা হলেও প্রমাণিত হত না যে রমা তাঁকে সেই পাপকার্যে সাহায্য করেছেন।

"তা হলে এই শহরের বিশিষ্টতম নাগরিকের একমাত্র কন্যা কেন আজ ঐ আসামীর কাঠগড়ায়? কেন তিনি মনুষ্য জীবনের চরমতম লাঞ্ছনার সম্মুখীন হয়েছেন? কি তার অপরাধ? শ্রদ্ধেয় সরকারী উকিলের মতে রমার অপরাধ—রমা ডাক্তারকে ভালবাসেন। বিধবা হয়েও সে পর-পুরুষের সঙ্গে অভিসার রজনী যাপন করেছেন। ধর্মাবতার, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনে শ্রীরাধিকা তাঁর ঘর-সংসার ও স্বামীকে ফেলে যমুনার তীরে ছুটে গেছেন, কিন্তু আমরা এই কুলনাশিনীকেই দেবীর মর্যাদা দিয়েছি। কারণ" থেমে একবার সরকারী উকিলের দিকে তাকালেন মিস্টার সেন। তারপরে বলেন, "ভালবাসা স্বর্গের অবদান, প্রেম ভক্তিমার্গের প্রথম আচরণ।"

"আমার বন্ধু বিচক্ষণ সরকারী উকিল অবশ্য ডাক্তার ও রমার এই ভালবাসার মধ্যে প্রেমের গন্ধ খুঁজে পান নি। তাঁর মতে রমা তাঁর অতৃপ্ত যৌবনের কামনা চরিতার্থ করার প্রয়োজনেই ডাক্তারের প্রতি আসক্তা। কিন্তু ধর্মাবতার, রমার প্রতিষ্ঠা, তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও রূপের কথা আপনার অজনা নয়। আপনিও জানেন যে তাঁর সামান্য একটু অনুগ্রহের বিনিময়ে" মিস্টার সেন আবার মিস্টার ব্যানার্জির দিকে তাকান, "এই শহরের অনেক সম্ভ্রান্ত নাগরিক, তাঁদের জীবন ও যৌবন অঞ্জলি দিতে প্রস্তুত আছেন।

"অতএব ধর্মাবতার আমার মক্কেল শ্রীমতী রমা দেবী সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাঁর অবিলম্বে বে-কসুর খালাস পাওয়া উচিত।"

মিস্টার সেন একটু থামেন। তারপরে ভাবগম্ভীর স্বরে বলতে থাকেন, "সর্বশেষে মহান আদালতের কাছে আমার আবেদন যে আমরা যেন আমাদের এই সুপ্রাচীন দেশের অতীত ঐতিহ্যের কথা ও কাহিনী বিস্মৃত না হই। সত্য ও ন্যায় রক্ষার জন্য এই মহান দেশের মহৎ মানুষ যুগে যুগে আত্মদান করেছেন। বিক্রমাদিত্য ও আকবরের সেই ভারতবর্ষ আজ গণতান্ত্রিক ভারতে রূপান্তরিত। আর আদালতই সেই গণতন্ত্রের ধারক। এ দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রথম কথা—দশজন অপরাধী প্রমাণের অভাবে বা বেনিফিট অব ডাউটের সুযোগে নিষ্কৃতি পেয়ে যাক, কিন্তু একজন নিরপরাধীও যেন মিথ্যে মামলায় শাস্তি না পান

"আমার স্থির বিশ্বাস মহান আদালত সেই অমূল্য উপদেশ স্মরণ করেই আসামীদের বিচার করবেন।" বিচারক ও জুরিদের কুর্নিশ করে মিস্টার সেন আসন গ্রহণ করেন।

"কিন্তু মিস্টার সেন, আপনার এই সুদীর্ঘ সওয়ালের কোথাও আপনি স্পষ্ট করে বললেন না যে কে এই হত্যাকারী?"

মিস্টার সেন আবার উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু তিনি কিছু বলতে পারার আগেই আদালতের দেয়াল ঘড়িতে দেড়টা বাজার সংকেতধ্বনি হয়। বিচারক, জুরি ও আদালতের জনমণ্ডলীর সমবেত নজর পড়ে ঘড়িটার দিকে। রণেন ও রমাও তাকায় সে দিকে। দর্শকরা ঘড়িটার এই বেয়াড়াপনায় বিরক্ত হন। আসল কথাটা শোনার আগেই সে বিরতির নির্দেশ দিয়ে দিল। নেহাতই বে-রসিক।

কিন্তু তাঁদের এই মন্তব্যে ঘড়িটার কি যায় আসে? সে সময়ের হিসেব করে চলেছে—নির্ভুল হিসেব। বিচারের গরমিল হতে পারে, কিন্তু তার হিসেবের গরমিল নেই। মানুষের বিচারে সে সময়ের বিচার করে না। সে দেখেছে মানুষের সময়ের কোন জ্ঞান

নেই। একই সময়ে কেউ হাসে, কেউ কাঁদে। কেউ পায়, কেউ হারায়। কেউ বিচারককে আশীর্বাদ করে, কেউ তাঁকে অভিসম্পাত দেয়।

"ইত্তর অনার! বিরতির আগে আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন—কে এই হত্যাকারী? আপনি বলেছিলেন, আমি আজকের সওয়ালে কোথাও স্পষ্ট করে সে কথা বলি নি। আপনার উক্তি সম্পূর্ণ সত্য ধর্মাবতার। তবে স্পষ্ট করে না হলেও অস্পষ্টভাবে আমি আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।"

বিচারক কিছু বলার আগেই একজন জুরি বলে ওঠেন, "আপনি সকলের সামনে স্পষ্ট করে বলুন মিস্টার সেন কে সেই পাষণ্ড, আর কেনই বা সে এই জঘন্য হত্যা করেছে?"

"পাষণ্ড সে নয়। আর সে এই হত্যা করেছে স্নেহের দায়ে।"

"আদালত প্রেক্ষাগৃহ নয় ধর্মাবতার।" মিস্টার ব্যানার্জি মন্তব্য করেন।

"কিন্তু আপনিই তো সওয়ালের সময় বলেছেন, কখনও কখনও বাস্তব কল্পনার চেয়েও অলীক হয়ে থাকে।"

মিস্টার ব্যানার্জি কিছু বলবার জন্য আবার উঠতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বিচারক তাকে ইশারায় বসিয়ে দিয়ে নিজে বলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমি এখনও পাই মিস্টার সেন—কে এই হত্যাকারী?"

"আমি অবশ্যই সে উত্তর দেব ধর্মাবতার। কিন্তু তার আগে আমি আমার পরমবন্ধু সরকারী উকিলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, হত্যাকারীকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব আমার নয়, সরকারপক্ষের। তবে তাঁরা যখন তাঁদের সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন, তখন আমিই সেই সুমহান দায়িত্ব পালন করব। কারণ পাপী অবশ্যই

তার পাপকার্যের জন্য শাস্তি পাবে। যদিও আমি জানি সমস্ত ঘটনা শোনার পরে তাকে আর আপনাদের পাপী বলে মনে হবে না। তাকে শাস্তি পেতে দেখে আপনাদের চোখের কোলে জল জমে উঠবে। তবু আদালতকে তার কঠিন কর্তব্য পালন করতে হবে। আদালত সত্য ও সুন্দরের মন্দির, ন্যায় ও নীতির তীর্থক্ষেত্র।"

মিস্টার ব্যানার্জি রাগত স্বরে বলেন, "হেঁয়ালী রেখে পরিষ্কার বাংলায় ধর্মাবতারের প্রশ্নের উত্তর দিন। বলুন, আপনার মতে কে এই হত্যাকরী?"

"আমি এই প্রশ্নের উত্তর দেব হুজুর।" আদালতকক্ষের দোরগোড়া থেকে সহসা নারীকণ্ঠ গর্জে ওঠে। সবাই বিস্ময়ভরে সে দিকে তাকান।

"মা! তুমি।" কাঠগড়া থেকে রণেন চিৎকার করে ওঠে। রমাও এগিয়ে আসে তার সঙ্গে।

মুহূর্তে আদালতের নীরবতার অবসান ঘটে।

"অর্ডার, অর্ডার।" বিচারক টেবিলে হাতুড়ির ঘা মারতে থাকেন। গোবিন্দর হাত ধরে রণেনের মা এগিয়ে আসেন বিচারকের সামনে। বিভ্রান্ত বিচারক প্রশ্ন করেন, "আপনি আপনার পুত্রবধূ মাধবী দেবীকে হত্যা করেছেন?"

"না হুজুর, আমি কেন তাকে খুন করব। কত আশা করে আমি তাকে ঘরে এনেছিলাম। আমার সে আশা সফল হল না হুজুর।" কান্নায় মায়ের চোখ সজল হয়ে ওঠে। কেঁদেছেন তিনি আজ কদিন ধরেই। কিন্তু বাকি জীবনটা তাঁকে যাতে কেঁদে না কাটাতে হয় তাই তিনি আবার আদালতে এসেছেন। আঁচল দিয়ে ঝাপসা চোখ দুটিকে মুছে নেন তিনি। তারপরে বিচারকের দিকে

তাকিয়ে স্থির কণ্ঠে বলেন, "আমি নয় হুজুর, এই সেই হত্যাকারী।"

"গোবিন্দদা ?" রণেন আবার চীৎকার করে ওঠে। তবে সে আর কিছু বলে না। কান্না বোধ হয় তার কণ্ঠ রোধ করে দিয়েছে। সে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

রমা তাড়াতাড়ি তাকে ধরে বসিয়ে দেয়। নিজেও তার পাশে বসে। এত কাছাকাছি ওরা দুজনে কখনও বসে নি আদালতে।

মাও খুবই বিচলিতা। তবু তিনি যথাসম্ভব অকম্পিত কণ্ঠে ছেলেকে বলেন, "হ্যাঁ বাবা, তোর জীবনে শান্তি আনার জন্য গোবিন্দই সেদিন রাতে তার ছোরা দিয়ে বউমাকে খুন করেছে।"

মিস্টার ব্যানার্জি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন "এত বড় মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই যখন গোবিন্দ এই হত্যা করেছে, তখন সে পুলিসের কাছে কেন অমন জবানবন্দী দিল।"

"মৃত্যু ভয়ে ব্যানার্জি, মৃত্যু ভয়ে। যার চেয়ে বড় ভয় আর কিছু নেই। মাধবীকে খুন করে ফেলে গোবিন্দর বাঁচার বড় ইচ্ছে হয়েছিল।" জনতার মধ্য থেকে একজন বুদ্ধিদীপ্ত বলিষ্ঠ সুপুরুষ সহসা বলে ওঠেন। সকলে তাঁর দিকে তাকায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই রমা বিস্মিত কণ্ঠে ডাক দেয়, "বাবা !"

"হ্যাঁ, মা আমি !" বলতে বলতে রায়বাহাদুর এগিয়ে আসেন কাঠগড়ার কাছে। শান্ত কণ্ঠে মেয়েকে বলেন, "ভাবিস নি মা। সব সমাধান হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত গোবিন্দর সেই ভয় কেটে গেছে। কারণ নিজের জীবনের চেয়ে সে ডাক্তারকে বেশি ভালবাসে। বাঁচবার আগ্রহটা তার একটা সাময়িক ইচ্ছা হয়ে দেখা দিয়েছিল। সে আদালতের সামনে সব কিছু স্বীকার করতে রাজি হয়েছে।"

উকিল মোক্তার দর্শক ও জুরি এমন কি বিচারক পর্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছেন। কেউ কোন কথা বলছেন না। আদালত-

কক্ষে একটা অস্থির নীরবতা বিচরণ করছে। সকলেই গোবিন্দকে দেখছে। পঞ্চাশোত্তীর্ণ স্নেহপ্রবণ ভৃত্য। ক্ষীণকায় ছোটখাটো মানুষটি। গায়ের রং বেশ কালো। মাথার চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা। পরনে একখানি মোটা ময়লা ধুতি। পা দু'খানি খালি। গায়ে একটা রঙিন হাফ শার্ট—একটিও বোতাম নেই। বুকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কে বলবে ঐ বুকের মধ্যে এত স্নেহ সঞ্চিত আছে? কে বলবে এই সাধারণ মানুষটি এমন অসাধারণ কাজ করেছে? কে বলবে সে খুনী?

বিচারকের প্রশ্নে নীরবতার অবসান হয়। বিচারক গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি মাধবী দেবীকে হত্যা করেছো?"

গোবিন্দ মাথা নাড়ে। সে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে।

"কেন তুমি এই নৃশংস কাজ করেছো?"

গোবিন্দ মুখ তোলে। একবার বিচারককে দেখে নিয়ে রণেনের দিকে তাকায়। তারপরে একখানি হাত দিয়ে রণেনকে দেখিয়ে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে, "ঐ ওর জন্য হুজুর। ওর জন্যই আমি তাকে খুন করেছি।"

"তাই বল, তা হলে ডাক্তার তোমাকে বলেছিলেন মাধবী দেবীকে খুন করতে।" মাঝখান থেকে মিস্টার ব্যানার্জি বলে ওঠেন।

বিচারক বিরক্ত হন। কিন্তু গোবিন্দ কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে মিস্টার ব্যানার্জির দিকে তাকিয়ে বলে,"রুণু কেন বলতে যাবে সে কথা। সে এ সব কিছুই জানত না। আমিই ওর কষ্ট দেখতে পারতাম না। বৌমা কেবলই ওকে সন্দেহ করত, সব সময় ওর সঙ্গে ঝগড়া করত।"

"তাই তুমি তাকে খুন করলে?" বিচারক বলে ওঠেন।

"না করলে রুণু জীবনে শান্তি পেত না হুজুর।"

'এ যুক্তি অবিশ্বাস্য ধর্মাবতার!" সরকারী উকিল মন্তব্য করেন, "স্নেহপ্রবণ ভৃত্য তার পুত্রসম মনিবের প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে আদালতের সামনে মিথ্যে কথা বলছে।"

"মিথ্যে কথা? আমি কখনও মিথ্যে বলি না হুজুর। সেদিন শুধু ফাঁসির ভয়ে দারোগাবাবুর কাছে স্বীকার পাই নি যে আমিই বউমাকে খুন করেছি। কিন্তু তখন একবারও ভাবি নি, আমি ছাড়া পেলে, রুণুর ফাঁসি হবে। ভেবেছি রুণু যখন বউমাকে খুন করে নি, তার কেন শাস্তি হবে। নিশ্চয়ই আপনি ওকে ছেড়ে দেবেন। তাই কর্তামা ও রায়বাহাদুরের কাছ থেকে যখন সব জানতে পারলাম, ছুটে এলাম আদালতে।"

"কিন্তু তুমি যে আজও ডাক্তার বাসু রয়কে বাঁচাবার জন্য এ সব কথা বলছ না, তা বুঝব কেমন করে? তোমাকে সব কথা বলতে হবে গোবিন্দ।" বিচারক বলেন।

পেস্কারের নির্দেশে গোবিন্দ গিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ায়। তারপরে স্থির কণ্ঠে বলতে শুরু করে, "বহুদিন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল হুজুর এ আমি কি করেছি! জোর করে রুণুর বিয়ে দিয়ে আমি তার জীবনে অশান্তি ডেকে এনেছি। সে নিজেও সুখী হয় নি, বৌমাকেও সুখী করতে পারে নি। ওদের মনের কোন মিল নেই। এক বাড়িতে থেকেও ওরা যেন রয়েছে অনেক দূরে। ভাবলাম এই দূরত্ব দূর করতে হবে। যেমন করেই হোক রুণুর জীবনে শান্তি আনতে হবে। তারপরে ছুটি নেব সংসার থেকে।

"আমার নিজের সংসার নেই হুজুর। রুণুর সংসারই আমার সংসার। কর্তাবাবু মারা যাবার পরে কর্তামা ওকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আমি ওকে ছেলের মতো মানুষ করেছি। সব সময়েই ওর ভাল চেয়েছি। ভেবেছি ওর শান্তিতেই আমার শান্তি। কিন্তু দিন রাত ভেবেও ওর শান্তির কোন উপায় বের করতে পারি

নি। কত বুঝিয়েছি বৌমাকে। কোন ফল হয় নি। সে সব সময়েই রুণুকে সন্দেহ করত। এই সময় খবর পেলাম একজন সন্ন্যাসী এসেছেন বকুলতলার মাঠে—সিদ্ধপুরুষ। মানুষের কপালের দিকে তাকিয়ে তার অদৃষ্টের কথা বলে দিতে পারেন। শান্তির বিধান দিতে পারেন। অনেক বলে-কয়ে রাজি করিয়ে রুণুকে নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। সন্ন্যাসী কিন্তু রুণুর সামনে বললেন না তেমন কিছু। শুধু জানালেন—বেটা সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে তার আগে তোকে কিছু ঝামেলা সইতে হবে। দুঃখকে জয় করার চেষ্টা করিস তা হলেই জীবনে শান্তি পাবি।

"রুণু একটু হেসে চলে এল। তার কাজ ছিল। আমি থেকে গেলাম সন্ন্যাসীর কাছে। তাঁকে বললাম—বাবা কি বললেন কিছুই বুঝতে পারলাম না। একটু খুলে বলুন।

সন্ন্যাসী বললেন—যা বলব, তা করতে পারবি।

আমি উত্তর দিলাম—মানুষের অসাধ্য না হলে নিশ্চয়ই করব। রুণুর শান্তির জন্য আমার কোন কিছুই করতে আপত্তি নেই।

—ওর এই বৌটা রাক্ষসী। সে থাকতে ওর জীবনে শান্তি আসবে না। তাকে মেরে ফেল। তা হলেই ওর জীবনে শান্তি আসবে।

—এ কি বলছেন বাবা। রুণুকে বিয়ে দিয়ে আমি তাকে ঘরে এনেছি।

—তাই তো তোকেই তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

—কিন্তু সে যে আমার মা। আমি মাতৃহত্যা করব।

—ছেলের জীবনে শান্তি আনতে হলে তাই করতে হবে।"

গোবিন্দকে থামতে হয়। সরকারী উকিল সহসা বলে ওঠেন, এটা ঠাকুরমার ঝুলির আসর নয় ধর্মাবতার। আমরা এই

সব অলীক কাহিনী শুনে আদালতের মূল্যবান সময়ের অপচয় করতে রাজি নই।”

“কিন্তু আদালত রাজী আছে মিস্টার ব্যানার্জি।” বিচারক বিরক্ত কণ্ঠে বলেন, “তুমি বলে যাও গোবিন্দ।”

সরকারী উকিল বাধ্য হয়ে আসন গ্রহণ করেন। গোবিন্দ বলতে থাকে, “সেই থেকে সন্ন্যাসীর কথাগুলো কেবলই আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। দিন রাত আমি কেবল ভাবতে থাকলাম, কিন্তু কোন কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। কাজকর্ম ঠিকমত করতে পারি না—সব কাজেই ভুল হয়ে যায়। বৌমা খিটখিট করে। বিরক্ত হয়ে চুপ করে থাকি। রুণু ভাবে—আমার অসুখ করেছে। সে নাড়ী দেখে, বুক পরীক্ষা করে। ওষুধ দেয় খেতে। আমি সে ওষুধ ফেলে দিই আস্তাকুড়ে। রুণুর জীবনে অশান্তি বেড়ে চলে। আমার জন্যও বৌমার কাছে তার কথা শুনতে হয়। বৌমার ওপর মন আমার ক্রমেই বিষিয়ে ওঠে। কিন্তু সন্ন্যাসীর আদেশ পালন করতে পারি না।

“এই সময় একদিন শেষ রাতে একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল। আর সেই তন্দ্রার ঘোরেই স্বপ্নটা দেখলাম। সেই সন্ন্যাসী আমাকে বলছেন—ছেলের শান্তির জন্য বৌমাকে মেরে ফেলায় কোন পাপ নেই। এ কাজে ভগবান তোর সহায়। তিনিই তোকে দিয়ে এ কাজ করাচ্ছেন। ভয় নেই, কেউ জানতে পারবে না তুই খুন করেছিস। আগামীকাল অমাবস্যা—মধ্যরাত্রেই ভাল সময়। ছেলে যদি নিজের থেকে বাইরে যায় ভাল নইলে যেমন করে হোক তাকে সরিয়ে দিতে হবে।

“পরদিন বিকেলে রুণু ডাক্তারখানায় বসে রোগী দেখছিল। আমি আশায় রইলাম যদি বাইরের কোন ডাক আসে সারারাতের জন্য। ডাক এল, কিন্তু সে রোগী দেখে ফিরে এল আটটার

মধ্যে। আমি ভগবানকে ডাকতে থাকলাম। কিন্তু কেউ ডাকতে এল না। রান্না-বান্না শেষ করে অস্থির মনে হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় এলাম। আর সেখানেই দেখা হল রিকশাওয়ালা বুধনের সঙ্গে। কথায় কথায় সে জানালো—রায়বাহাদুরের খুব অসুখ। সে বিনয় ডাক্তারকে পৌঁছে দিয়ে এসেছে তাঁর বাড়িতে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ঘড়ি দেখার নাম করে ডাক্তারখানায় ঢুকলাম। টেলিফোন করলাম রমাকে। রায়বাহাদুরের অসুখের জন্য আমার দুশ্চিন্তার কথা জানিয়ে তাকে বললাম রুণুকে ডাকতে। তারপরে ওদের দুজনকে খেতে দিয়ে নিজে খেয়ে নিলাম।

"কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক এল। রুণু প্রস্তুত হল যাবার জন্য। কিন্তু বৌমা দিল বাধা। ঝগড়াঝাঁটির পরে রুণু চলে গেল। সে আমাকে বলল ঘরে গিয়ে শুতে। কিন্তু আমি সে কথা শুনলাম না। ঘরে গিয়ে ছোরাখানি নিয়ে ফিরে এলাম দালানে। বাইরের দরজা বন্ধ করে আবার এলাম ডাক্তারখানায়। রমাকে ফোন করে ওদের, ঝগড়াঝাঁটির কথা জানালাম। বললাম সে যেন আজ রাতে রুণুকে রেখে দেয় তাদের বাড়িতে। রমা রাজি হল। তারপর আমি এসে বৌমার ঘরের দোর গোড়ায় শুয়ে পড়লাম। অপেক্ষায় রইলাম কখন সে ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু তার ঘুমোবার নাম নেই। সে শুয়ে শুয়ে রুণুকে গালাগালি করতে থাকল। আমাকে দায়ী করল তার জীবনটা নষ্ট করার জন্য। ভয় দেখাল—সে রুণুর নামে মামলা করবে। সে তাকে শাস্তি দেবে। আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল।

"অবশেষে এক সময় বৌমা ঘুমিয়ে পড়ল। তারপরে……" গোবিন্দ সহসা থেমে যায়।

"বল, তাবপরে।" বিচারক আদালতের নীরবতা ভঙ্গ করেন।

. . ডুকরে কেঁদে ওঠে গোবিন্দ। কিছুক্ষণ পরে কান্না জড়ানো কণ্ঠে বলে, "তারপরে সব শেষ করে ফিরে এলাম ঘরে।"

"কিন্তু তুমি যে ডাক্তার বাসু রয়কে বাঁচাবার জন্য মিথ্যে কথা বলছ না, তুমিই মাধবী দেবীকে হত্যা করেছ, তার কোন প্রমাণ দিতে পারো।"

"প্রমাণ?" কি যেন ভাবে গোবিন্দ। তারপরে হাত দেয় তার জামার পকেটে। একটা কাপড়ের পুঁটলি বের করে পেস্কারের হাতে দিয়ে বলে, "এই যে প্রমাণ হুজুর। বৌমার গায়ের সব গয়না আছে এতে।"

পেস্কার পুঁটলিটা খুলে বিচারকের সামনে রাখেন। বিচারক ইশারায় ডাক্তারের মা ও মাধবীর দাদাকে কাছে ডাকেন। জিজ্ঞেস করেন, "দেখুন তো এগুলো মাধবী দেবীর গয়না কিনা?"

তাঁরা দুজনেই বলে ওঠেন, "হ্যাঁ।"

বিচারক ডাক্তারকে বলেন, "আপনি যখন রায়বাহাদুরকে দেখতে যান, তখন এই গয়নাগুলো মাধবী দেবীর গায়ে ছিল?"

ডাক্তার মাথা নাড়ে। বিচারক গোবিন্দকে প্রশ্ন করেন, "তুমি এগুলো তাঁর গা থেকে খুলে নিয়েছিলে কেন?"

গোবিন্দ মুখ তোলে। বিচারকের দিকে তাকিয়ে ধীরস্বরে বলে, "ঘরে এসেই বসে পড়লাম বিছানায়। কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। তারপরে হঠাৎ মনে হল আমার ছোরা দিয়ে বৌমাকে খুন করেছি। রুণু চেনে এ ছোরা। সে বুঝতে পারবে, আমি এ কাজ করেছি। অনেক ভেবে আবার এলাম বৌমার ঘরে। আলো জ্বালালাম। সব শেষ হয়ে গেছে। আর কোনদিন সে মামলা করতে পারবে না রুণুর সঙ্গে। রণুর জীবনে শান্তি আসবে। হাতে কাপড় জড়িয়ে ছোরাখানি টেনে তোলার চেষ্টা করি। পারি না, শক্ত হয়ে বসে গেছে বুকে। নাড়া দিতেই

ঝলকে ঝলকে রক্ত বের হতে থাকে। গরম রক্ত। তাড়াতাড়ি ছোরাখানা ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে আসি। ভাবতে থাকি কি করে ছাড়া পাব এই খুনের দায় থেকে। হঠাৎ বুদ্ধিটি মাথায় আসে—বৌমার গায়ের গয়নাগুলো খুলে লুকিয়ে রেখে দিলে সবাই ভাববে, এই গয়নার জন্যই খুন হয়েছে সে। রুণুকে আগের থেকে বলে নিলেই হবে যে ছোরাখানি চুরি গেছে। ছোরাখানির কথা সে যেন কাউকে না বলে।

"কিন্তু তার আর সুযোগ হয়ে ওঠে নি। রুণু যে অত সকালে আসবে, আমি তা বুঝতে পারি নি। আমি তাকে কিছু বলার আগেই সে সুবিমলবাবুকে বলে দিয়েছে ছোরার কথা।"

"কিছুক্ষণ আগে রায়বাহাদুর বলেছেন—নিজেকে বাঁচাবার জন্য তুমি, যার জন্য এই খুন করেছ, সেই ডাক্তারকে খুনের আসামী হতে দেখেও পুলিসের কাছে অপরাধ স্বীকার কর নি। এ কথা কি সত্য ?" একজন জুরি গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করেন।

"হ্যাঁ, হুজুর। আমি তখন স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন আমার সে ভয় কেটে গেছে।" গোবিন্দ বিচারকের দিকে তাকায়, "আমাকে শাস্তি দিন হুজুর—কঠিন শাস্তি। শুনেছি ফাঁসির চেয়ে বড় শাস্তি নেই। আমাকে তাই দিন, কিন্তু ফাঁসির আসামীর শেষ ইচ্ছা নাকি আপনি মঞ্জুর করেন হুজুর।"

"নিশ্চয়ই করব। বল কি তুমি চাও ?" বিচারক বলেন।

"রুণু যেন রমাকে বিয়ে করে আবার সংসারী হয়। আমি তাহলে নিশ্চিন্তে মরতে পারব হুজুর—নরকে গিয়েও শান্তি পাবো।"

রুণুর জীবনে শান্তি আসুক গোবিন্দর জীবনের বিনিময়ে। 'বুঝিলাম স্নেহ অতি বিষম বস্তু।'

ভূত ও ভালুক

ভূত থাকে সমতলে আর ভালুক পাহাড়ে। ভূত থাকে লোকালয়ে আর ভালুক পাণ্ডববর্জিত জঙ্গলে। ভূত মানুষকে ভয় দেখায় আর ভালুক নাকি মানুষকে ভয় করে। ভূত আর ভালুক যে পাশাপাশি বাস করতে পারে, তা জেনে এলাম এবারে। জেনে এলাম যে ভূত হতে পারে নির্দোষ, আর ভালুক হতে পারে নির্ভীক। জানলাম হিমালয়ে, কেদারনাথ অভিযানে গিয়ে।

গঙ্গোত্রী হিমবাহ সমীক্ষা সংস্থার কেদারনাথ অভিযানে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিল অমূল্য সেন (নেতা), প্রাণেশ চক্রবর্তী (সহ-নেতা), বীরেন সরকার, সুজল মুখার্জী, হিমাদ্রি ভট্টাচার্য, করুণাময় দাস, অসিত বসু, রামনাথ শর্মা, বরেণ্য মুখার্জী ও ডাক্তার স্বপন রায়চৌধুরী। ছিলেন প্রতিরক্ষা দপ্তরের এঞ্জিনিয়ার মেজর পি. এস. মূর্তি, জিওলজিক্যাল সার্ভের শ্রী এ. পি. তেওয়ারী, বটানিক্যাল সার্ভের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী শ্রী বি. ডি. নাইথানি এবং পাঁচজন শেরপা—নিমা, ছুঞ্জে, দা রিঞ্জি, সোনা ও দোরজি।

৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৬৭) কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে ঋষিকেশ উত্তরকাশী ও হরশিল হয়ে গঙ্গোত্রী পৌঁছলাম ১৮ই তারিখে। আমাদের দল ছিল খুবই বড়—আঠারো জন সদস্য। এতবড় কোন বে-সরকারী দল এর আগে পর্বতাভিযানে আসে নি। তাছাড়া আমরা এবারে কেবল পর্বতারোহণ করতে আসি নি, সেই সঙ্গে হিমালয়ের বৃহত্তম ও বিশ্বের বিচিত্রতম হিমবাহ অঞ্চলের (গঙ্গোত্রী) বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করতেও এসেছি। তাই আমাদের সঙ্গে প্রচুর খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সরঞ্জাম ও

যন্ত্রপাতি। সব মিলিয়ে ওজন প্রায় সাড়ে তিন টন। কিন্তু আমরা কুলি পেয়েছি মাত্র পঞ্চাশ জন। তাই কুলিরা দু'বারে সব মাল গোমুখী নিয়ে যাবে, আর সেখান থেকে তিনবারে মূল-শিবিরে নেবে। ফলে ভাগীরথীর উৎস গোমুখীতে আমাদের একটি অন্তর্বর্তীকালীন শিবির স্থাপন করতে হবে। সেই শিবির থেকেই ভূত আর ভালুকের এলাকা। কিন্তু গানের আগে যেমন আলাপ, কাহিনীর আগে তেমনি একটু প্রস্তাবনার প্রয়োজন। তাই গঙ্গোত্রী থেকেই শুরু করা যাক।

১৯শে সেপ্টেম্বর সকালে দলের ন'জন সদস্য শেরপা ও কুলিদের নিয়ে রওনা হল গোমুখীর পথে। এখন গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখী বারো মাইল। সাত মাইল গিয়ে চিরবাসা। চিরবনে ছাওয়া রমণীয় স্থান। ভাগীরথীর তীরে চমৎকার একটি বিশ্রাম-ভবন নির্মিত হয়েছে। সেখানেই রাত্রিবাস করল ওরা। মেট দেবী দত্ত সন্ধ্যার আগেই সব মাল ঘরের ভেতরে তুলে দিল। চিরবাসায় নাকি বড়ই ভালুকের উৎপাত।

পরদিন সকালে ওরা রওনা হল গোমুখী। তিন মাইল এগিয়ে ভূজবাসা—ভূজ গাছের জঙ্গল। রাস্তা থেকে নিচে ভাগীরথীর বেলাভূমিতে স্বামী বিহারীলালজীর কুঠিয়া। ডাক্তার স্বপন অসুস্থ স্বামীজীর চিকিৎসা করল। তারপরে ওরা এগিয়ে চলল গোমুখীর পথে।

ভূজবাসার পরে জঙ্গল শেষ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে শেষ হল ভালুকের আবাস। শুরু হল পাথর। পাথর আগেও ছিল। কিন্তু এখন শুধুই পাথর। কেবল মাঝে মাঝে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ফুল। ওরা ভালুকের কোন কাজে লাগে না। তাই এটা ভালুকের এলাকা হলেও ভালুক এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে না।

গোমুখীতে মাল পৌঁছে দিয়ে সন্ধ্যার সময় কুলিরা ফিরে এল গঙ্গোত্রী। পরদিন সকালে আমরা বাকি মাল নিয়ে যাত্রা করলাম গোমুখী। চিরবাসায় ঝরনার ধারে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়া হল। তারপরে আবার পথ-চলা। পথে ভালুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না, কিন্তু তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পেলাম।

সন্ধ্যার একটু আগে আমরা গোমুখী এলাম। এলাম ভারতের পুণ্যতম প্রবাহ ভাগীরথীর উৎসে। এলাম ভারতের দুর্গমতম তীর্থপথের প্রান্তে। এখানে তীর্থযাত্রীর পথ শেষ, কিন্তু পর্বতাভিযাত্রীর পথ শুরু।

চারিপাশের প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে। ভূ-বিজ্ঞানী বললেন, ১৯৩৫ সালের পরে আর এ অঞ্চলের কোন সমীক্ষা হয় নি। গত বাইশ বছরে ভাগীরথীর উৎস-মুখ প্রায় তিন ফার্লং পেছিয়ে গেছে।

উৎসের খানিকটা নিচে নদীর ডান তীরে, পাথরের মাঝে একখানি সমতল প্রান্তর। সেখানেই তাঁবু পড়েছে আমাদের। দুটি সাদা বড় ও পাঁচটি ছোট রঙীন তাঁবু। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

দেখতে পেয়ে ছুটে এল ওরা। কাঁধ থেকে রুকস্যাক খুলে নিজেরা কাঁধে নিল। তারপরে প্রাণেশ জিজ্ঞেস করল, "পথে ভালুকের সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি?"

"না। তোমাদের দেখা হয়েছিল বুঝি?"

"হ্যাঁ। পরশুদিন চিরবাসায়। বেশ ভালুক আছে এ অঞ্চলে।"

কথা বলতে বলতে এগিয়ে এলাম তাঁবুর ধারে। হঠাৎ নজর পড়ে—একটা জায়গায় কিছু শুকনো ফুল জড়ো হয়ে আছে। পুঁতে রাখা হয়েছে একখানি ভূর্জ গাছের ডাল। করুণাময় বলে, "ভূত-পুজো করা হয়েছে।"

"ভূত?" বিস্মিত হই। "ভূত আছে নাকি এখানে?"

"ওরা তো বলে আছে।" সুজল উত্তর দেয়।

"আর এখানকার থেকেও নাকি বেশি আছে তপোবনে। সেটাই ওদের মূল ঘাঁটি।" হিমাদ্রি যোগ করে।

"সর্বনাশ! সেইখানেই যে আমরা মূল-শিবির করব।"

"তাই তো ভাবছি।" বীরেন বলে "ভাবছি তপোবনে মূল-শিবির করব না। আরও এগিয়ে যাব। সেই পাথরের প্রান্তরটিকে পেরিয়ে ছোট সমতল ক্ষেত্রটিতে মূল-শিবির স্থাপন করব। কি বলেন অসিতদা?"

"তা করতে পার। কিন্তু তুমি কি ভয় পেয়ে গেলে নাকি?" অসিতবাবু বললেন।

"না, ভয় পাই নি। তবে ভাবনা হয়েছে বৈ কি। সত্যিই যদি অলৌকিক কিছু ঘটে, তাহলে একজন কুলিকেও ধরে রাখতে পারবেন না, সবাই পালিয়ে যাবে।" বীরেন বুঝিয়ে দেয়।

"তাই বোধহয় কাল তোরা ভূত-পূজো করেছিস?" অমূল্য বলে।

"হ্যাঁ।" বরেণ্য উত্তর দেয়।

ভূত আর ভালুক সম্পর্কে আর কোন কথাবার্তা হয় না। আমরা তাঁবুতে এসে আশ্রয় নিই। এখানে সব সময়ে প্রবল বাতাস বয়। বাইরে বসে থাকা কষ্টকর।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল পাচক বীরবাহাদুরের ডাকে---সাব বেড-টি।

তাহলে তো রাত ফুরিয়েছে। কাল রাতে ভূত বা ভালুক কেউই আসে নি। এলে নিশ্চয়ই টের পেতাম।

আজ আমাদের বিশ্রাম। কাল আমরা ন'জন গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখী এসেছি। আর ওরা ন'জন শেরপাদের সঙ্গে মাল নিয়ে

তপোবনে গেছে। তাই আজ কেবল কুলিরাই মাল নিয়ে ওপরে গেল। যাবার সময় সুজল ওদের বলে দিল, "কাল যেখানে মাল ফেলে এসেছি, সেখানে মূল-শিবির হবে না। তোমরা তপোবনের পরে যে পাথুরে প্রান্তরটি আছে, সেটি ছাড়িয়ে গিয়ে মাল ফেলবে।"

ওরা চলে যাবার পরে আমরা উৎস-মুখ দেখতে চললাম। সত্যই চারিদিক বদলে গেছে। উৎস-মুখ সরে গেছে পেছনে। আকারে বড় হয়েছে, ভয়াবহ হয়েছে। এখন সে নামেই গোমুখী। দেখতে মোটেই গরুর মুখের মতো নয়।

ফিরে এসে দেখি উত্তরকাশী পর্বতারোহণ শিক্ষা-কেন্দ্রের রেজিস্ট্রারার শ্রীকে. পি. শর্মা অ্যাডভান্স কোর্স নিয়ে পৌঁছে গেছেন গোমুখী। তিনি এখানে শিক্ষার্থীদের শৈলারোহণ শিক্ষা দেবেন তিন দিন ধরে। তারপরে তাঁদের নিয়ে গঙ্গোত্রী ও চতুরঙ্গী হিমবাহ হয়ে কালিন্দী খাল অতিক্রম করে বদ্রীনাথ যাবেন। আর সেদিনই শিক্ষা-কেন্দ্রের সহ-অধ্যক্ষ মেজর সুরৎ সিং বেসিক কোর্স নিয়ে এখানে আসবেন। কথায় কথায় শর্মাকে জিজ্ঞেস করি, "ভালুক বুঝতে পারি, কিন্তু ভূত···। সত্যই কি এখানে ভূত আছে নাকি?"

একটু হেসে শর্মা বলেন, "ঠিক এখানে নয়, ওপরে—তপোবনে।"

"কেমন করে জানলেন? আপনি দেখেছেন?"

"না। তবে আমার একটি শিক্ষার্থী দেখেছে।" একটু থেমে শর্মা বলতে শুরু করেন, "আপনারা জানেন ১৯৬৬ সালের ২২শে অক্টোবর ভাগীরথী অভিযানকালে কলকাতার অমর রায়, শেরপা গিয়ালবু ও কারমা মারা গেছে। আমাদের গত বেসিক কোর্সে একজন বাঙালী শিক্ষার্থী এসেছিল। সে অমরকে চিনত।

বেসিক কোর্স এখানে এসে সাতদিন থাকে। শৈলারোহণ শিক্ষা দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষার্থীদের ওপরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁবু ফেলে তপোবনে আমরা একটা রাত কাটাই।

গত বেসিক কোর্সও তাঁবু ফেলেছিল তপোবনে। কোন কারণে সেই বাঙালী শিক্ষার্থী গভীর রাতে তাঁবুর বাইরে বেরিয়েছিল। চাঁদনী রাত। তেমন কুয়াশাও পড়ে নি। চারপাশের পর্বতশৃঙ্গগুলি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। দেখা যাচ্ছিল ভৃগুপর্বত ও শিবলিঙ্গ। দেখা যাচ্ছিল গঙ্গোত্রী হিমবাহ। দেখা যাচ্ছিল ভাগীরথী—যে পর্বতশৃঙ্গ অভিযানকালে অমর, গিয়ালবু ও কারমা শহীদ হয়েছে।

"বাঙালী শিক্ষার্থীটি সহসা দেখতে পায়--তিনজন পর্বতারোহী রুকস্যাক পিঠে নিয়ে ভাগীরথীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের তিনজনেরই মাথা নেই।

"মুণ্ডহীন ঐ তিনটি মানুষ যে ভূত ছাড়া আর কিছুই নয়, তাতে কারও সন্দেহ নেই। ফলে এ অঞ্চলের ভূতের অস্তিত্বের কথা রটে গেছে চারিদিকে।"

পরদিন অর্থাৎ ২৩শে সেপ্টেম্বর সকালে, আমাদের অধিকাংশ অভিযাত্রী কুলি ও শেরপাদের নিয়ে চলে গেল ওপরে। গোমুখীকে ডানদিকে রেখে পৌঁছল গঙ্গোত্রী হিমবাহে। বরফ পাথর আর ফাটলের সেই দুর্গম হিমবাহ অতিক্রম করে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠল—পৌঁছল তপোবনে। শিবলিঙ্গ পর্বতের পাদদেশে বিস্ময়কর তৃণভূমি তপোবন। সুসমতল। কোমল মাটি। একটি ঝরনা যাচ্ছে বয়ে। ডানদিকে শিবলিঙ্গ, বাঁদিকে গঙ্গোত্রী হিমবাহ। প্রায় মাইল দেড়েক দীর্ঘ। তারপর মাইল আধেক পাথরে বোঝাই—বিরাট বিরাট পাথর। পাথরের শেষে ছোট একটি সমতলক্ষেত্র। সেখানেও ঝরনা আছে একটি। গঙ্গোত্রী

হিমবাহ বাঁক নিয়েছে সেখানে। কাজেই প্রান্তরটির প্রায় দুদিকেই হিমবাহ। হিমবাহের ওপারে ভাগীরথী পর্বত। তিনটি শৃঙ্গের অনিন্দ্যসুন্দর পর্বতশৃঙ্গ। ১৫,৫৪২ ফুট উঁচু এই সমতল ক্ষেত্রটিতে প্রতিষ্ঠিত হল আমাদের মূল-শিবির। এখানে শিবির প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ কারণ—এখান থেকে পরবর্তী অর্থাৎ অগ্রবর্তী মূল-শিবির নিকটতর হবে। আর পরোক্ষ কারণ, এখানে ভূত নেই।

সব মাল-পত্র নিয়ে, গোমুখীর শিবির গুটিয়ে আমি, স্বপন ও বরেণ্য মূল-শিবিরে এলাম দু'দিন বাদে—২৫শে সেপ্টেম্বর। আরও দুটি দিন গোমুখীতে আমরা নির্বিঘ্নে কাটিয়েছি। ভূত ও ভালুক কোন ক্ষতি করে নি আমাদের।

মূল-শিবিরে এসে শুনলাম—গতকাল অর্থাৎ ২৪শে সেপ্টেম্বর কীর্তি বামক (হিমবাহ) ও গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গম থেকে দেড় মাইল ভেতরে, কীর্তি হিমবাহের ওপরে ১৬,৫০০ ফুটে, আমাদের অগ্রবর্তী মূল-শিবির স্থাপিত হয়েছে। প্রাণেশ, হিমাদ্রি, করুণা, অসিতবাবু, রামনাথ ও মেজর মূর্তি চলে গেছে সে শিবিরে।

পরদিন বীরেন ও অমূল্য চলে গেল ওপরে। তারপর সুজল, স্বপন ও বরেণ্য গেল চলে। পাচক মণিরামকে নিয়ে আমি রইলাম মূল-শিবিরে। সকালে কুলিরা মাল নিয়ে ওপরে কিংবা জ্বালানী আনতে নিচে চলে যায়। ভূ-বিজ্ঞানী ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরাও সমীক্ষা ও সংগ্রহে বের হন। রান্নাঘরে মণিরাম আর তাঁবুতে আমি। আমার প্রচুর অবসর। আমি কেবল চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখি। দেখে আর আশ মেটে না। সবচেয়ে ভাল লাগে ভাগীরথীকে। মনে হয় যেন কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পী বাটালি দিয়ে খুদে খুদে, একখানা সুবিরাট শ্বেতপাথর থেকে তৈরি করেছে তাকে। কখনও রোদে, কখনও মেঘে, কখনও কুয়াশায় স্নান করছে সে। তারপরে রং বদলাচ্ছে—পোশাক পালটাচ্ছে।

কর্মহীন দিন কেটে যায়। বিকেলে কুলিরা ফিরে আসে ওপর থেকে খবর আনে ওরা কতদূর এগিয়ে গেল, কাল কি কি মাল ওপরে পাঠাতে হবে। নিচের থেকে ডাক আনে—প্রিয়জনের কুশল সংবাদ আসে।

দিনে দুজনে থাকি মূল-শিবিরে। রাতে একা থাকি তাঁবুতে। আমরা ভাগীরথীর এত কাছে, কিন্তু কোথায় ভূত। তারা কেউ আসে না।

ওপর থেকে খবর আসে ২৭শে সেপ্টেম্বর কেদারনাথ ডোমের পশ্চিম গিরিশিরার নিচে ১৮,৭৫০ ফুটে একনম্বর শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২৯শে সেপ্টেম্বর কেদারনাথ ডোমের উত্তর-পশ্চিমে ২০,৬০০ ফুটে দু'নম্বর শিবির স্থাপিত হল।

৩০শে সেপ্টেম্বর করুণাময়, রামনাথ ও তিনজন শেরপাকে নিয়ে অমূল্য ২২,৪১০ ফুট উঁচু কেদারনাথ ডোম-শীর্ষে আরোহণ করেছে।

হিমালয়ের আর একটি দুর্গম শিখরে বাঙালী অভিযাত্রীরা জাতীয় পতাকা প্রোথিত করল।

নিচের থেকে খবর আসে—সহ-অধ্যক্ষ মেজর সাহেব বেসিক কোর্স নিয়ে গোমুখী এসে গেছেন। তিনি শিক্ষার্থীদের নিয়ে একদিনের জন্য এখানে আসবেন।

সবই যেমন চলবার কথা ছিল, তেমনি চলছে। কেবল যাদের আসবার কথা ছিল, তারা কেউ আসে নি। আসে নি ভূত, আসে নি ভালুক।

২রা অক্টোবর সকালে উঠে দেখি কাল রাতে অত্যধিক তুষারপাত হয়েছে। ঝরনাটি গেছে শুকিয়ে। ভারী মুশকিল! জল ছাড়া চলবে কেমন করে। মণিরামকে বললাম, "চল, কাল তাঁবু নিয়ে তপোবনে চলে যাই। সেখানে জল আছে।"

"নহী সাব, কভি নহী। উধারমে ভূত বহুত তং করতা।"

বিকেলে কুলিরা ও মেট দেবী দত্ত ফিরে এল। তাদেরও দেখলাম একই মত—তপোবনমে ভূত বহুত তং করতা।

অতএত আর তপোবনে যাওয়া হল না আমার। তপোবনে ভূত আছে।

পরদিন দুপুরে মেজর সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে একা দেখে বিস্মিত হলাম। জিজ্ঞেস করি, "শিক্ষার্থীরা কোথায় ?"

"শিবিরে। আমি এসেছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে।"

"শিবির কোথায় করেছেন ?'

"তপোবনে।"

সর্বনাশ ! মেজর কি জানেন না যে সেখানে ভূতের উৎপাত ! কথাটা বলা উচিত হবে না। একটু চুপ করে থেকে বলি, "কিন্তু আপনি তো লিখেছিলেন, এখানে শিবির করবেন।"

"হ্যাঁ। ভেবেছিলাম। কিন্তু কুলিরা রাজী হল না।"

কুলিরা রাজী হল না এখানে আসতে ! বিস্মিত হই। বলি, "কেন ?"

"এই · এমনি।"

মনে হচ্ছে মেজর কিছু চেপে যেতে চাইছেন। আমিও নীরব থাকি।

একটু বাদে সহসা মেজর বলেন, "তুমি তো কয়েকদিন ধরেই এখানে আছ। কখনও কিছু টের পেয়েছ ?"

প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারি না। বলি, "কি টের পাব ?"

"মানে...এই ভূত-টুত বা ওরকম কিছু ?"

"ভূত ? এখানে ?" মেজরের প্রশ্নে আশ্চর্য হই। "এখানে তো ভূত নেই, ভূত তো আপনার ওখানে—তপোবনে। তাই এখানে জল ফুরিয়ে যাবার পরেও আমার কুলিরা তপোবনে শিবির

সরিয়ে নিয়ে যেতে রাজী হল না। কারণ ওখানে নাকি বড্ড ভূতের উৎপাত।"

"সেকি?" এবার মেজরের অবাক হবার পালা। অথচ আমার কুলিরা কিছুতেই এখানে আসতে চাইল না। বলল—ইধারমে ভূত বহুত তং করতা।"

এবার আমাকে হেসে উঠতে হয়। মেজরও আমার সঙ্গে হাসতে থাকেন। হাসি থামলে মেজর বলেন, "তাহলে কি সাব্যস্ত হল?"

"এখানে ভূত নেই, ওখানেও ভূত নেই। হিমালয় ভূতের নিবাস নয়,' হিমালয় দেবালয়। পর্বতাভিযানের সময় যারা শহীদ হয়, তারা অক্ষয় স্বর্গলাভ করে।"

শেষ হল ভূতের কাহিনী। এবারে ভালুকের কথা শুরু করা যাক। ৭ই অক্টোবর সবাই নেমে এল মূল-শিবিরে। এখনও আমাদের প্রায় পঞ্চাশজন কুলির মাল রয়েছে, অথচ কুলি আছে মাত্র পঁচিশজন। বাকি কুলিদের আমরা ছেড়ে দিয়েছি মূল-শিবিরে পৌঁছে। তাই আবার গোমুখীতে শিবির করতে হবে।

৮ই অক্টোবর আমরা গোমুখী এলাম। পরদিন কুলিরা মূল-শিবির থেকে বাকি মাল এনে সোজা নেমে গেল চিরবাসা। দেবী দত্ত গেল তাদের সঙ্গে। কুলিরা মাল রেখে আজই ফিরে আসবে গোমুখী। দেবী চিরবাসায় থাকবে দুদিন—মাল পাহারা দেবে। কাল সকালে বাকি মাল নিয়ে আমরা নেমে যাব গঙ্গোত্রী। পরশু গঙ্গোত্রী থেকে কুলিরা এসে চিরবাসার মাল নিয়ে যাবে।

৯ই অক্টোবর সন্ধ্যার সময় কুলিরা ফিরে এল গোমুখী। ফেরার পথে ওরা নাকি একটা ভালুকের সামনে পড়ে গিয়েছিল।

ভালুকটা অবশ্য ওদের কাছে আসতে সাহস পায় নি। পথের ওপর থেকে একটা পাথর গড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে।

পরদিন সকালে আমরা গঙ্গোত্রী রওনা হলাম। বত্রিশ দিন বাদে ঘরে ফিরে চলেছি। এসেছিলাম কেদারনাথ অভিযানে। শূন্যহাতে হিমালয়ে এসেছি সেদিন। আর আজ তার সৌন্দর্যের খনি থেকে মণি আহরণ করে মনের মণিকোঠা পূর্ণ করে ফিরে চলেছি ঘরে। অথচ হিমালয় সেদিন যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। চিরকাল তাই থাকবে।

মহানন্দে পথ চলে চিরবাসা পৌঁছলাম। ডাক-বাংলোর সামনেই দেবী দত্তের সঙ্গে দেখা। সে রুকস্যাক কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করি, "কোথায় চলেছ? তোমাকে তো আজ রাতটাও এখানে থাকতে হবে।"

"সাব, কখনও আপনার অবাধ্য হই নি। কিন্তু আজ···আজ আমাকে ক্ষমা করতে হবে। আমি একা এখানে থাকতে পারব না। আমি মরে যাব সাব।"

দেবী কাঁদতে শুরু করে।

অবাক হই। সাহসী মানুষ দেবী দত্ত। কেন সে চলে যেতে চাইছে? তবে কি এখানেও ভূতের ভয়? একটু বাদে বলি. "খুলে বল তো কি হয়েছে? কেন তুমি থাকতে চাইছ না এখানে?"

দেবী বলতে শুরু করে—কাল কুলিদের সঙ্গে সে বিকেলে এখানে এসে পৌঁছয়। দুখানি ঘর নিয়ে বিশ্রাম-ভবন। একটু দূরে রান্নাঘর। কুলিরা চলে গেল। দেবী রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে রান্নাঘরে এল। জল এনে স্টোভ ধরালো। চায়ের জল চাপালো। চা খেয়ে রান্না চড়ানো যাবে। হঠাৎ সামনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে নজর পড়ে। ভালুক। উঠানের

একধারে একটা ভালুক দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে তাকিয়ে তাকেই দেখছে। পাহাড়ী মানুষ দেবী দত্ত—কুলির সর্দারী করে জীবন কাটে তার। বহুবার ভালুকের সঙ্গে এমন দেখা হয়েছে। সে ভয় পায় না। চিৎকার করে ওঠে। ভয় পায় ভালুক। সে চলে যায়। খুশী হয় দেবী। তারই জয় হয়েছে।

চায়ের জল হয়ে আসে। দেবী চা ভিজায়। তারপরে মগ ধুতে বাইরে আসে। ভাগ্যিস এসেছিল। নইলে আজ তার কি হাল হত, গঙ্গাজীই জানেন। একটা নয়, দুটো নয়, কম করেও গোটা আটেক ভালুক। সারি বেঁধে এদিকে আসছে। ওরা কি তাকে আক্রমণ করতে আসছে। তাছাড়া আর কি হতে পারে।

আর সেখানে দাঁড়ায় না দেবী। সে ছুটে আসে ঘরে। তাড়াতাড়ি দোরে খিল দেয়। জানালা বন্ধ করে। পড়ে রইল আটা আর আলু, স্টোভ আর বাসনপত্র।

অভুক্ত দেবী সারারাত ঘুমোতে পারে নি। খিদের জন্য নয়। পাহাড়ী মানুষ সে। উপোসের অভ্যেস আছে। ঘুমোতে পারে নি ভয়ে। অকারণে নয়। ভালুকগুলি সারারাত ঘরের দরজা ভাঙার চেষ্টা করেছে। কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। তাঁরা বোধহয় এমনি ভালুক-আক্রমণের আশংকা করেই দরজা-জানালাগুলো অত্যন্ত শক্ত করে বানিয়েছেন। নইলে আজ হয়তো আমাদের সঙ্গে আর দেবী দত্তের দেখা হত না।

আজ সকাল হবার পরেও ভালুকরা চলে যায় নি। মেট দেবী দত্তকে ঘেরাও করে রেখেছে। কিছুক্ষণ আগে ওপরের রাস্তায় কুলিদের সাড়া পেয়ে সে প্রাণপণে চিৎকার করেছে। তাই শুনে কুলিরা বিশ্রাম-ভবনে গেছে। ঘেরাও তুলে নিয়েছে ভালুকরা। দেবী দরজা খুলেছে কিন্তু রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে বুঝেছে ভালুকরা চলে যাবার আগে চিহ্ন রেখে গেছে।

আটা আলু দুধ গুড় ও ঘি খেয়ে নিয়ে বাসনপত্র আর স্টোভ ফেলেও রেখে চলে গেছে।

ভূত না-থাকলেও ভালুক যে আছে আর সে থাকা যে ভূত থাকার চেয়ে কম ভয়াবহ নয়, তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে এবার আমরা হিমালয় থেকে এসেছি ফিরে।

শেষ